ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস

গোপাল ঘোষ

লোক ইতিহাস প্রকাশন
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
সুমিত্রা ঘোষ
লোক ইতিহাস প্রকাশন
১৬৮, আমহার্স্ট স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ : শ্রীমলয় শঙ্কর দাসগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ—ডিসেম্বর, ১৯৬৭

মুদ্রাকর :
বীরেন ব্যানার্জী
সমবায় প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩।২, শশীভূষণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

বাঁধাই :
কৃষ্ণা বাইণ্ডিং
৬৭, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

* মুদ্রণ প্রমাদবশতঃ ৪র্থ অধ্যায়টি ৫ম অধ্যায় হিসাবে ছাপা হয়েছে। অতএব ৫ম ও পরবর্তী অধ্যায়গুলি ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম এই ক্রমানুযায়ী পড়িতে হইবে।

মুখবন্ধ

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে কয়েক বছর আগেই শতবর্ষ অতিবাহিত হয়ে গেছে—কিন্তু, আজও শ্রমিক আন্দোলনের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা হয় নি। যদিও বিভিন্ন সময়ে শ্রমিক আন্দোলনের উপর কয়েকটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে এবং এইসব পুস্তকগুলোর সবকয়টি প্রথম মহাযুদ্ধের সমকাল থেকে শ্রমিক আন্দোলনে সময়রেখা ভিত্তি করে লেখা হয়েছে, সে জন্যই সে সব প্রকাশিত পুস্তক শ্রমিক আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। সে সব পুস্তকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী কালের শ্রমিক আন্দোলনের কিছু কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ আছে মাত্র।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ভারতের শ্রমিক-শ্রেণী, আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে যে ঐতিহাসিক ধর্মঘট করেছিল এবং তার পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে বিরাট বিরাট ধর্মঘট করে' কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবি আদায় থেকে আরম্ভ করে বেতন বৃদ্ধির দাবি পর্য্যন্ত আদায় করে নিয়েছিল এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নিজেদেরকে একাত্ম করে নিয়েছিল, আর সর্বোপরি রাজনৈতিক সচেতনতায় পরিপক্কতার যে প্রকাশ দেখিয়েছিল—সে সব ঘটনা লিখিতভাবে আজও অনুপস্থিত। এইসব ঘটনা ঢাকা পড়ে আছে বহু পুরানো সংবাদপত্রের ধূলি মালিন্যের মধ্যে। সেখান থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা' এই বইতে লিপিবদ্ধ করেছি। তবুও বলব, এই বই ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম পর্বের স্বয়ংসম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়—একটি

প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। সেভাবেই একে পাঠকদের গ্রহণ করতে অনুরোধ করব।

আমাদের মত একজন সাধারণ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর জন্য ভারত সরকারের মহাফেজখানা ও প্রাদেশিক সরকারের দলিল দস্তাবেজ-কেন্দ্রে প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ। আমার বই লেখার সময়কাল পর্যন্ত, সে-সব জায়গায় ঢুকতে পারি নি। যদিও আমেরিকার ও বিদেশের তথাকথিত 'গবেষকরা' সে-সব জায়গায় প্রবেশ অধিকার পেয়েছেন। বহু পুরানো সংবাদপত্রের পাতা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আমাকে এই কাজটি সম্পূর্ণ করতে হয়েছে, যদিও বহুক্ষেত্রে সে-সব সংবাদপত্রের সম্পূর্ণ খণ্ড সংগ্রহ করা যায় নি।

আমি ভারতের শ্রমিক আন্দোলন কয়েকটি পর্বে ভাগ করে অগ্রসর হয়েছি, প্রথমকাল হ'ল শুরু থেকে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্বকাল হ'ল ১৯২১ সাল থেকে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা কাল পর্যন্ত। এই দুটি পর্ব নিয়ে আমি ইতিহাস রচনা করব এবং তৃতীয় খণ্ডেরও একটি পরিকল্পনা আছে; বর্ত্তমানে প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হ'ল।

প্রথম খণ্ডটি লেখা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রথম মনে পড়ল **বঙ্কিমদা'র** (মুখোপাধ্যায়) কথা, যিনি মৃত্যুর এক বছরের মধ্যেই আমাদের স্মৃতিকোণ থেকে মুছে গেলেন। কিন্তু বাঙলা দেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস যেদিন রচিত হবে, সেদিন সেখানে উদ্ভাসিত হয়ে থাকবেন—আমাদের **'বঙ্কিমদা'**। তাই তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই খণ্ডটি শেষ করলাম।

ডিসেম্বর, ১৯৬৭

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশ

ক। ঐতিহাসিক পটভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীতে, ভারতে এক নতুন যান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী দেখা দিতে লাগল। প্রথমে আসে পুঁজিপতি শ্রেণী। তারপর কারখানায় যে শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম হল, সেই শ্রমিক শ্রেণী এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর আবির্ভাবের ফলে ভারতের আর্থিক ও সামাজিক জীবনে আসে নতুন যুগ, নতুন দ্বন্দ্ব। এ নতুন ইতিহাসের সুরু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হলেও, এর অঙ্কুরের আভাস দেখা গিয়েছিল যোড়শ শতাব্দীতে।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে বাণিজ্য করার সনদ পায়। ঐ সনদে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকেই ভারতে বাণিজ্যের একমাত্র অধিকারী বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। কোন ইউরোপীয় এদেশে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য বা কৃষিকার্যের জন্যে এবং বসবাস করবার জন্যে অনুমতির প্রয়োজন হলে সেই অনুমতি তা দেওয়া না-দেওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ওপর।

প্রায় দেড় শতাব্দী কাল ব্রিটীশ বেনিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের নাম করে ধীরে ধীরে ভারতের রাজনৈতিক জীবনকে তার অক্টোপাসের

মত সর্বনাশা বাহুতে জড়িয়ে ধরতে ধরতে শেষে বণিকের মানদণ্ড ফেলে তুলে নিল হাতে তারা রাজদণ্ড।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পলাশীর বিপর্যয়ে ভারতের স্বাধীনতার ওপর চরম আঘাত হানল। আর ক্রমে ভারতের স্বাধীনতার চুড়ান্ত বিপর্যয়ের দিকেই নিশানা দেখায় ইতিহাস। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে আসার পর থেকে বিশেষ করে পলাশীর বিপর্যয়ের পর, ভারতে এমন লুণ্ঠন চালায় যে এদেশের শিল্প-ঐশ্বর্যের গর্ব বিস্মৃতির গর্ভে প্রায় বিলীন হয়ে যায়। এ সময়ে ভারতে শিল্প-ঐশ্বর্যের যে কী রকম প্রাচুর্য ছিল তার প্রমাণ মেলে নানা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মারকে। একজন ইংরেজ লেখিকা বলছেন: অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলক ভাবে ছিল অগ্রসর। এবং উৎপাদন পদ্ধতি ও ব্যবসাবাণিজ্য-সংগঠন পৃথিবীর যে কোন দেশের সঙ্গে তুলনীয়।[১] ব্রিটীশ বেনিয়া কোম্পানীর আসার প্রত্যক্ষ ফল হল ভারতের কুটিরশিল্প এবং বিখ্যাত বস্ত্রশিল্প ধ্বংস সাধন। এবং ক্রমে ক্রমে ভারতের জনসাধারণ আরও একটি নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করার জন্যও প্রস্তুত হতে থাকলেন। আর তা হ'ল ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে।

"কৃষি ও কারুশিল্পের ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে গঠিত, সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের সমাজজীবনের বনিয়াদ ছিল তথাকথিত গ্রামীন সংগঠনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সংগঠন ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জীবনের দ্যোতক।"[২]

পূর্ববর্তীকালে, ভারতের গ্রামীন অর্থ নৈতিক সংগঠনের বনিয়াদের ওপর ব্রিটীশ শাসকগোষ্ঠী আঘাতের পর আঘাত হানে এবং তাঁর ভিত্তিকে চুরমার করে ফেলে। ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে, ইংল্যাণ্ড একটি

১। The Economic Development of India—Dr. Vera Anstey
২। The British Rule in India—Karl Marx

আইন পাশ করে ও ভারতের বস্ত্রশিল্পের রপ্তানীর ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হ'ল। এবং একই উদ্দেশ্যে ১৭২১—১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে আরও দু'টি আইন করা হয়েছিল। এভাবে ভারতে কুটিরশিল্প ধ্বংস ক'রে, ভারতের বাজারে ব্রিটীশ পণ্য বিক্রীর ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। ব্রিটীশ শাসকগোষ্ঠীর এ কাজ যেমন ছিল ভারত-বিরোধী, তেমনি কোম্পানী-বিরোধীও। কারণ, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মানুযায়ী এ ছিল বেনিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে আঘাত। যে বেনিয়া কোম্পানী ভারতের বাজারের দোর খুলে দিয়ে ব্রিটীশ শিল্পপতিদের নিয়ে এল তারই অলক্ষ্যে হাতে নিয়ে এল বেনিয়া কোম্পানীর মৃত্যুপরোয়ানা।

"ভৌগোলিক দিক থেকে, এক একটি গ্রাম শত সহস্র একর কর্ষণযোগ্য ও পতিত জমি নিয়ে গঠিত। রাজনৈতিক দিক থেকে এটি একটি স্বায়ত্তশাসনভোগী নগর রাজ্য বা মিউনিসিপ্যাল সংগঠনের অনুরূপ।"[৩] ব্রিটীশ শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার জন্যে ভারতের রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থার যে পরিবর্তন দরকার একথা ইংলণ্ডের শিল্পতন্ত্রীরা ভাল করে বুঝেছিল। তাই তাঁরা ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশ-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন বিধিবদ্ধ করার মধ্যে দিয়ে সামাজিক জীবনে ব্রিটীশ শাসকগোষ্ঠীর জন্যে একশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক সামন্তশ্রেণীর সৃষ্টি করল, যারা কৃষকশ্রেণীর ওপর সামন্ত প্রথায় শোষণ ও শাসনের অবাধ জাঁতাকলে কৃষকশ্রেণীকে নিষ্পিষ্ট করতে লাগল। ফলে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের গতিমুখে জমিদারী প্রথার অভিশাপের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। শিল্প বিকাশের নতুন যুগকে অবহেলা করে ভারতের বিত্তবান শ্রেণী জমির মধ্যেই নিজেদের প্রাণ খুঁজে নিল। ভারতের সঞ্চিত পুঁজি জমিতে আবদ্ধ হয়ে গেল। এ পুঁজি নিয়োগকারীরা ছিল নতুন সামন্তপ্রভু—যাদের

৩। **British Rule in India—Karl Marx**

কৃষিকাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক ছিল না। তারাই হলেন "মানী" জমিদার-জোতদার। অর্থাৎ "জমির মালিক"।

ভারতবর্ষের এ পরিবর্তনশীল সামাজিক পটভূমিকার যুগে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বনিয়াদ কি? দু'শো বছর আগে গ্রেটবৃটেন প্রধানত ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। জনসংখ্যার প্রতি ছয় জনের মধ্যে পাঁচ জন গ্রাম্য সমাজভুক্ত। জনসাধারণের ব্যাপক অংশ জমি বা ছোট ছোট কুটিরশিল্প অথবা উভয় ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল।[8]

সপ্তদশ দশকে ইংলণ্ডের নতুন উৎপাদন প্রণালীর আবিষ্কারের ফলে জীবনযাত্রার প্রণালীতে মৌলিক পরিবর্তন আসে। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হার গ্রীভ্সের বয়নযন্ত্র, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াটের আবিষ্কৃত ষ্টীম ইঞ্জিন, ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আর্করাইটের সুতো-কাটার যন্ত্র, ১৭৭৯ খ্রীঃ ক্রমটনের গ্রিউল, ১৭৮৫ খ্রীঃ লোহা গলাবার ও ইস্পাত প্রস্তুত করবার নতুন যন্ত্র ইত্যাদি উৎপাদন প্রণালীর নতুন নতুন আবিষ্কার ইংলণ্ডের সামাজিক অবস্থার এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। ইংলণ্ডের এমন নগদ পুঁজি ছিল না, যাতে এ আবিষ্কারগুলো সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে। সেটি সম্ভব হল ভারত থেকে লুণ্ঠিত ঐশ্বর্যে। আর এভাবে বৃটেনের মন্থরগতি শিল্প-যানে নতুন খোরাক যোগায় ভারতের কাঁচা সম্পদ। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্যে যে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক ছিল, সে-দাবিও পূরণ করে ভারতের লুণ্ঠিত সম্পদ। তাই ইংলণ্ডের বড় বড় কারখানাগুলিতে যে প্রচুর পণ্য উৎপন্ন হতে লাগল, তার তখনি একটি বিরাট বাজারের প্রশ্ন আসে শিল্পপতিদের মনে। প্রশ্নের সঠিক নির্দেশ করে সে-আবার ভারতই। আর ভারতে আগে থেকেই

৪। **Britain's Labour Movement—Study Syllabus.**

একটা তৈয়ারী বাজার হয়ে ছিল। এতদিন যার প্রবেশ দ্বারে ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সতর্ক প্রহরা।

ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক জীবনে এইসব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ফলে, রাজনীতিতেও ক্রমশ ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। সতরো শতকের প্রারম্ভে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক জীবনে যে সব অভ্যুত্থান ঘটে তা, ক্রমে ক্রমে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গ্রেট বৃটেনের রাজনৈতিক জগতে আনে এক মহাপ্রলয়: গ্রেট বৃটেনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যন্ত্রও শিল্পীপতিদের কুক্ষিগত হতে থাকে। এবং মূলত এ পরিবর্তনের ধনতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশের পথে রাষ্ট্রযন্ত্র সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ইউরোপীয়দের এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার দেওয়া বা না দেওয়ার একচেটিয়া ক্ষমতা ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ওপর, ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সে একচেটিয়া ক্ষমতা অবসান হয়। "১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য করার একচেটিয়া অধিকার শেষ হওয়ায় ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক শোষণের এক নতুন দিকের সূচনা হল। কোম্পানীটি ছিল একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এবং এর অধিকাংশ আয়ই হত লণ্ডনের বাজারে প্রাচ্যজাত উৎপন্ন বস্তু বিক্রয়ে। এর একটি লণ্ডন কোম্পানী ছিল এবং লণ্ডন ছিল ব্রিটীশ বণিকদের কেন্দ্র। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দেও এটি ব্রিটীশ শিল্পের কেন্দ্র ছিল না। এই সময়ের পর থেকে ইংলণ্ডজাত দ্রব্য বিশেষ করে ল্যাঙ্কাশায়ারের সূতী বস্ত্রাদি ভারতে রপ্তানী হতে শুরু হয়। এর এক যুগের কিছু উর্দ্ধে ভারতে রপ্তানীকৃত দ্রব্যাদির মূল্য প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল এবং তুলাজাত দ্রব্যাদি তিনগুণ হয়েছিল, ২০ খ্রীষ্টাব্দে বার্ষিক প্রায় ২,০০০০০০ পাউণ্ডের হয়েছিল।"[৫]

৫। A People's History of England—A. L. Morton

এ ভাবেই ভারত বস্ত্র-রপ্তানীকারক দেশ হ'তে, আমদানীকারক দেশে পরিণত হল। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য ছিল: এদেশকে কাঁচামালের সরবরাহ ও ইংলণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যের বাজার হিসেবে পরিণত করা।

খ। ভারতে শিল্প বিকাশের আন্দোলন

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেড়াজাল ভেঙ্গে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বিচিত্র ভাবে ভারতে প্রথম যন্ত্রশিল্পের উদ্বোধন হ'য়ে গেল। ব্রিটীশ পুঁজির উদ্যোগে 'ফোর্ট গ্লাষ্টার মিল' ভারতে প্রথম সূতাকল যা পশ্চিম বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করা হল। সে প্রাচীন সূতাকলটি আজ 'বাউড়িয়া কটন মিল' নামে অতীতের অগ্রগামীর স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে, আজও হাওড়ায় জৌলুস নিয়ে টিকে আছে। সেই প্র-প্র-পিতামহ মিলের আশে-পাশে আছে অজস্র কথা, কাহিনী।

"ভারতে প্রথম মিল চালু করার কাহিনীতে একটি করুণ অধ্যায় আছে। ১৮১৯ সালে ল্যাঙ্কাশায়ার হতে কিছু মেয়ে এসেছিল বাংলা দেশের মিলে আধুনিক পদ্ধতিতে কাজ চালু করার জন্যে। বাউড়িয়া পুরোনো মিলের এলাকায় একটি ছোট কবরখানা ঘাসের আচ্ছাদনে সাদা স্মৃতি ফলকটি এখনও সাক্ষ্য দিচ্ছে সেইসব মেয়েদের অতি দ্রুত মৃত্যুর।"[৬]

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথম আধুনিক কারখানা গড়ে উঠলেও, তাঁর তিরিশ বছর পর ভারতের শিল্প যুগের সুরু বলতে হয়। এ যুগ খুব স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ পথে এগোয়নি তাঁর জন্যে প্রয়োজন ছিল আন্দোলনের।

'গোধূলি লগ্ন ভারত'-কে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার

৬। Labour in India—Kelman

জন্যে যে আন্দোলন সংগঠিত করতে হয়েছিল তার পুরোভাগে ছিলেন রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর। সামন্তবাদের আশ্রয়ে মানুষ আওয়াজ তুললেন 'অবাধ বাণিজ্যের'। এ সময় সমকালীন ইংলণ্ডের শিল্পপতিরাও ভারতে অবাধ বাণিজ্যের নীতি প্রবর্তনের জন্যে আন্দোলন করছিলেন। ভারত ও ইংলণ্ডের এ আন্দোলনের দুটি ধারা একই লক্ষ্য খুঁজে বেড়াল। ইংলণ্ডের প্রয়োজন ছিল তার আধুনিক উৎপন্ন দ্রব্যের জন্যে সম্প্রসারণ বাণিজ্য নীতি, আর ভারতের এ বিষণ্ণ যুগে প্রয়োজন ছিল নতুন আধুনিক চেতনার, যার ইঙ্গিত হিসেবে দেখা দিল যন্ত্র। এবং তারই জন্যে চাই অবাধ বাণিজ্য। ভারতের বুদ্ধিজীবীদের এ চিন্তাধারায় যেমন একদিকে ছিল প্রগতির প্রতি আকর্ষণ, অন্যদিকে এতে পরোক্ষ বৃটিশ শাসন ও শোষণের আরও সুযোগ ঘটে গেল। অর্থাৎ ধনতন্ত্রের বীজ ধীরে ধীরে সামন্ততন্ত্রের মূলে কঠিন আঘাতের জন্যে 'গোকুলে বাড়িতে' লাগল। ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যেমন এক নতুন বিপ্লবের সূচনা ঘটল; তেমনি ধনতন্ত্রের কতকগুলো অভিশাপ ধীরে ধীরে সমাজকে ক্লেদাক্ত করে তুলল। এ ঘটনার ফলে সামাজিক জীবনে শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটিয়ে নতুন একশ্রেণী বিন্যাসের সূচনা করল। আবার এরই মধ্যে বৃহৎ পুঁজির ভবিষ্যৎ যেন কথা কয়ে ওঠে।

এদেশে অবাধ-বাণিজ্য নীতি চালু হল। তবে প্রশ্ন আসে: ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে নতুন যুগের সূচনা হল, এ-দেশের উদীয়মান উদারনৈতিক শ্রেণী কি তা পুরোপুরি ভাবে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন?

রামমোহন রায়ের অকাল মৃত্যুতে, তাঁর পক্ষে এ দেশে শিল্প-স্থাপনে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু অবাধ

বাণিজ্যের আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বয়ং এ-দেশে শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম তিনিই বাংলা দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজ করেছিলেন। আর এ-দিকে ইউরোপায়রা এ-দেশে শিল্পবিকাশের কোন উৎসাহ না দিয়ে, ভারতকে কাঁচা মালের সরবরাহ দেশে পরিণত করার জন্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করল। ব্রিটেনের বস্ত্র শিল্পের মালিকেরা ভারতে তুলোর চাষে উৎসাহ দিতে লাগল। এ উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইউরোপীয়রা বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে কতকগুলো ফার্ম খোলে। ফলে প্রতি বছরে হাজার হাজার বস্তা তুলো ইংলণ্ডে চালান হ'তে থাকে।

গ। ভারতে প্রথম কোম্পানী

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চীনের বাজার হাতছাড়া হয়ে যায়। চীন দেশ ছিল কোম্পানীর চা বাণিজ্যের একমাত্র উৎস। "১৮১৩ সালের পর থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান আয় হতে লাগল একচেটিয়া চীনের চায়ের ব্যবসা হতে। এই ব্যবসাটি আরো কুড়ি বছর ধরে চলে। ক্যান্টনে দেয় দামের মোটামুটি দ্বিগুণ দামে বৎসরে প্রায় ৪০০০০,০০০ পাউণ্ড দামের চা প্রতি বৎসর বিক্রয় করেছিল।"[৭] এ ধরনের একটি লোভনীয় লাভজনক ব্যবসা হাতছাড়া করা যায় কী করে! আরো নিজের দেশে চায়ের চাষ করার মত প্রাকৃতিক সম্পদও তাদের নেই। এ রকম অবস্থায় পড়ে, ভারতকে চা-শিল্পের জন্যে বিকল্প দেশ হিসাবে কোম্পানী গ্রহণ করল। চা-শিল্পের উপর গভর্নর জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চীন দেশে

৭। A People's History of England—A. L. Morton

চা-ব্যবসার একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করছিল। এদেশে চা-শিল্প প্রসারে কোম্পানী কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে একচেটিয়া ব্যবসা রদ হওয়ার পরে ভারতে চা-শিল্পের জন্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়।"

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের ব্রিটীশ পুঁজি নিয়ে প্রথম 'আসাম টী কোম্পানী' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগেও ভারতের মাটিতে চায়ের চাষ হ'ত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সে সব বাগিচাগুলি আসাম টী কোম্পানীর কাছে হস্তান্তরিত করে।

প্রথম চা কোম্পানী আসামে বাগিচা শিল্পের জন্যে জমি সংগ্রহ করলেও, চা-শিল্পের জন্যে উপযুক্ত শ্রমিক ভারতে সংগ্রহ করা সম্ভবপর ছিল না। একমাত্র চীন দেশেই দক্ষ চা-শ্রমিক তখনকার দিনে পাওয়া যেত। চীন দেশ থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করে ব্রিটীশ কোম্পানীটি দস্যুবৃত্তির ইতিহাসে আর একটি নতুন দৃষ্টান্ত উপস্থিত করল।

বাগিচা শিল্পের গোড়াপত্তনের ইতিহাসে আছে অনেক বেদনা-দায়ক ঘটনা। ভারতে চা-শিল্পের জন্যে ব্রিটীশ বণিকেরা চীন দেশ থেকে জোর করে চীনা শ্রমিকদের ধরে নিয়ে আসত। এই চীনা শ্রমিকেরাই ভারতের মাটিতে বাগিচা শিল্পের উদ্বোধন করে। কিন্তু অধিকাংশ অগ্রগামী চীনা শ্রমিক আসামের মাটিতে মৃত্যুবরণ করে। তাদের জন্য ব্রিটীশ বণিকেরা কোন স্মৃতিফলক নির্মাণ করে রেখে যায়নি। কারণ তার মধ্যে ছিল বেনিয়া শাসকদের অনেক পাপের ইতিহাস। কিন্তু 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' তাদের বহু স্মৃতি অনাগত কাল পর্যন্ত আসামের উঁচু পাহাড়ে এবং কঠিন মাটিতে স্মৃতির ফলক হিসাবে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে। আসাম টী কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগে দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্রিটীশ পুঁজির সহযোগিতায় চা-শিল্পের জন্যে 'বেঙ্গল টী এসোসিয়েশন'

স্থাপন করেন। এ ছাড়া তিনি নিজেও চিনির কল ও কোলিয়ারী স্থাপন করেছিলেন। তাঁর উদ্যোগপর্ব ব্রিটীশ শিল্প পুঁজির আঘাতে ব্যর্থ হয়ে যায়। এভাবেই ভারতীয় মূলধনে বাংলা দেশে শিল্পের যে উদ্যোগ পর্বের উন্মোচন হয় তা মূলেই বিনষ্ট হয়। যে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরেজদের কর্মনৈপুণ্যের, মূলধনের এবং পরিশ্রমের অবাধ ব্যবহারে ভারতে শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর মুখেই শুনতে হয় "ওরা দেশবাসীর সব কিছুই আত্মসাৎ করবে—জীবন, স্বাধীনতা, সম্পদ।"

যেখানে যে কোন উদ্যোগপর্ব দেখা গেছে সেখানেই পড়েছে বিদেশী শাসনের শ্যেন দৃষ্টি ফলে শেষ পর্যন্ত তা পর্যবসিত হয় ব্যর্থতায়। আর ফলে ভারতের চারিদিকে দেখা যায় কেবল ধ্বংসস্তূপ। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ নির্মম শাসন ও শোষণের পাশাপাশি গড়ে তুলেছিল কায়েমী শাসনব্যবস্থার দৃঢ় স্তম্ভ। তাদের শাসনের ভিত্তিমূল খুব আয়াসেই গড়ে তুলতে তারা কিন্তু পারেনি। কারণ ভারতের জনগণ প্রতিবাদের সামান্য সুযোগ পর্যন্ত অপব্যবহার করেনি বরঞ্চ তারা গড়ে তুলতে চেয়েছিল প্রতিবাদের দৃঢ় প্রাচীর, যার মূল লক্ষ্য ব্রিটীশবিরোধী সংগ্রাম। সংগ্রামে ভাষা ও প্রেরণা জুগিয়েছে, তৎকালীন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। এ সময়েই আবার ভারতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়।

ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভারতে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় দেখা দেয়। যদিও বিদেশী শাসকের ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্নরূপ। তাঁরা চেয়েছিল, নিজেদের শাসন-ব্যবস্থাকে সংগঠিত করে তোলার জন্যে একদল অর্ধ-শিক্ষিত কেরানী। কিন্তু সে সময়ে ভারতের অগ্রগামী মনীষীরা এ ইংরাজী শিক্ষার সুযোগকে জাতীয় নব জাগরণের কাজে ব্যবহার করতে একটুও পিছপা হননি;

আর সে-কাজকে আরও ব্যাপ্ত করে তোলার জন্যে ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছিল একদল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। পরে সমস্ত ভারতব্যাপী এক ধূমায়িত বিক্ষোভ। বিক্ষোভ দমন এবং ভারতের শাসন ও শোষণের কাজকে দ্রুত সংযোগ সাধনের জন্য বিদেশী শাসক গড়ে তুলল রেল পথ। এ রেল পথ গড়ে তোলার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একজন ইংরেজ ইতিহাসবিদ বলেছেন: বেশ নির্বিঘ্নেই রেলপথ নির্মাণের কাজ সমাধা হল। এর উদ্দেশ্যের মূলে ছিল অংশত বাণিজ্যিক ও সমরনৈতিক তাগিদ। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সৈন্য পাঠানো এবং ইংরেজদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে যাতে ভারতীয় শষ্য, তুলো, চা এবং অন্যান্য কাঁচামাল যা পরে সস্তায় গরুর গাড়ীতে করে বন্দরে স্থানান্তরিত করা হবে।[৮]

ভারতে রেলপথ খোলার পেছনে ব্রিটীশ শাসকের আর একটি যে উদ্দেশ্য ছিল তা তদানিন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করেছেন, "যে-তুলো ভারত ইতিমধ্যেই উৎপাদন করেছে, সে-তুলো ইংলণ্ড চাইছে...পৃথিবীর এ-অংশে এমন এক অবস্থার মধ্যে নতুন নতুন বাজার খুলে যাচ্ছে যে, তার মুল্য নিরূপণ করা, কিংবা ভবিষ্যৎ আবার হিসাব করা সর্বাপেক্ষা গুণী ব্যক্তির দূরদৃষ্টিরও অতীত।"

ভারতে রেলপথ স্থাপনের জন্যে বিলেতী কোম্পানীকে কোন আর্থিক ঝুঁকি নিতে হয়নি।

ভারতে রেলপথ গড়ে তোলার জন্যে ব্রিটীশ কোম্পানী বিনামূল্যে জমি পেল, এবং ব্যবসায়ে লাভ হবে না এ আশঙ্কায় তাঁরা সরকারের কাছ থেকে মূলধন লগ্নীর ওপর শতকরা ৫ টাকা সুদের প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিয়ে

৮। ঐ

তারা আরও অঙ্গীকার করিয়ে নিলেন যে ব্যবসায়ে লোকসান হলে রাজকোষ হতে তা মিটিয়ে দেওয়া হবে। স্বভাবতঃই রাজকোষটি ভারতীয়।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে রেল লাইন খোলার একটি সাধারণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। বোম্বের কুরালা থেকে থানা পর্যন্ত একটি লাইন খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। এই লাইনটি 'বোম্বে গ্রেট ইস্টার্ন রেলওয়ে' নামে পরিচিত ছিল। এই ছোট লাইনটি খোলার জন্য যে অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়, তাদের রিপোর্টটি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে এপ্রিল বোম্বের টাউন হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় অনুমোদন করিয়ে নেওয়া হয় এবং ঐ সভায় 'ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি গঠন করা হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের এ-অঞ্চলে রেলওয়ে প্রসারের সুযোগ অনুসন্ধান করা। একই উদ্দেশ্যে ব্রিটীশ পুঁজি নিয়ে ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হল—'গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা কোম্পানী এবং তাঁদের অভিমত অনুযায়ী এবং লণ্ডন কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্যে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে বোম্বেতে আর একটি কমিটি গঠন হয়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ১লা আগস্ট এক আইনের বলে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিসুলা কোম্পানীটিকে আইনে বিধিবদ্ধ করা হল এবং ১৭ই আগষ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয় কোম্পানীর সঙ্গে নবপ্রতিষ্ঠিত রেলওয়ে কোম্পানীর ভারতে রেল-লাইন গড়ার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে একদল ব্রিটীশ ইঞ্জিনিয়ার ও স্টোরকিপার বোম্বাইতে এলেন। এবং ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে একটি ব্রিটিশ কোম্পানীর সঙ্গে রেলওয়ে কোম্পানী চুক্তি হয়—থানা পর্যন্ত রেললাইন পাতার।[১]

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল বোম্বাই থেকে থানা পর্যন্তএকুশা

১। Bombay City Gazzeteer

মাইলের একটি ট্রাফিক রেললাইনের উদ্বোধন হল। এ দিনটি বোম্বাইতে তখন ছুটির দিন হিসাবে পালিত হয়।[১০]

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা দেশে রানীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ খোলে। এভাবেই খুবই অল্প দিনের মধ্যে ভারতের চারিদিকে রেলপথ ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতে রেললাইন পাতার ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্পর্কে কার্ল মার্কসের মন্তব্যে আছে ; যে দেশ লোহা এবং কয়লায় সমৃদ্ধ, সে দেশে যখন একবার রেলইঞ্জিন চালু হয়েছে তখন আর তার গতিবেগ থেকে সরে আসা যায় না। আর এতবড় বিশাল দেশে পুরোপুরি ভাবে রেলপথ পাততে হলে রেলপথ ও গাড়ী নির্মাণ সংক্রান্ত ব্যাপারে যেসব যন্ত্রপাতি প্রয়োজন এবং যন্ত্রায়নের ব্যবহারের জন্যেই এসব শিল্পনির্মাণ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে যা প্রত্যক্ষভাবে রেলপথের সঙ্গে সংযুক্ত। এ-রেলশিল্প আধুনিক শিল্পের ভাগ্য হিসেবে যেন দেখা দিল।

ভারতে রেলপথ স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প বিকাশের এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। রেলপথের ফলে ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের যে নবযুগ শুরু হয়, তার পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়ে ভারতীয় বণিকেরা বিরাট পুঁজি সংগ্রহ করে ফেলল। এ বেনিয়া পুঁজির গর্ভেই ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম। পার্শী সম্প্রদায় হল, ভারতে প্রথম শিল্পিপুঁজি শ্রেণী। যদিও দ্বারকানাথ প্রথমে শিল্পপুঁজি লগ্নার প্রথম প্রয়াস করেন, কিন্তু তার প্রচেষ্টা শৈশবেই বিনষ্ট হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পারস্যদেশ থেকে পার্শী সম্প্রদায় ভারতে আসে। খুব সামান্য অবস্থা থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষ করে রপ্তানি-বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে তাঁরা পুঁজি সঞ্চয় করে। ভারতীয় তুলা ম্যানচেষ্টারের শিল্পপতিদের যোগান দিয়ে ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় স্ফীত হয়ে ওঠে।

১০। ঐ।

ঘ। ভারতে তুলো চাষ ও ভারতীয় পুঁজির বিকাশ

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডে তুলা সরবরাহ উৎস ভেঙ্গে পড়ল। গৃহযুদ্ধের মধ্যে আমেরিকা থেকে এক গাঁটও তুলো আসা সম্ভব ছিল না। অথচ আমেরিকার তুলো ইংলণ্ডের সুতাকল চালু রাখার একমাত্র ভরসা। ব্রিটীশ শিল্পপতিদের স্বার্থে ভারতে তুলো চাষের অভিযান সুরু হয়।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের অনেক কাল আগেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে তুলো চাষের উৎসাহ দিয়ে আসছিল। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বিনামূল্যে ভাল তুলোর বীজ বিলোনো হয় এবং ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে তুলো পরিষ্কার করার যন্ত্র নিয়ে আসা হয় এবং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে তুলো চাষের জন্যে একজন আমেরিকান কৃষককে এদেশে নিয়ে আসা হয়েছিল। এভাবে ভারতে আধুনিক শিল্পের জন্যে তুলো চাষের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আবার আমেরিকার কৃষকের সাহায্যে এদেশের অনেক জায়গায় তুলোর চাষ করে। কিন্তু এ ধরনের প্রাথমিক উদ্যোগগুলি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহের ফলে ব্যাহত হয়। তখন আবার আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে এদেশে তুলো চাষ এক বিরাট বাণিজ্য ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। তুলো চাষের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় বণিক পুঁজি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে ভারতীয় তুলোর চাহিদা বাড়ে। আর ভারতীয় বণিকেরা, বিশেষ করে পার্শী সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা দুহাতে টাকা লুটতে লাগল।

বোম্বাই শহর ছিল এ ব্যবসার মুলকেন্দ্র। আর প্রাণকেন্দ্রটি ছিল পার্শী সম্প্রদায়ের হাতের মুঠোয়। ১৮৬১—৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, যে সময়ে আমেরিকার তুলো ইংলণ্ডে রপ্তানী একবারে বন্ধ ছিল, সে

সময়ে বোম্বাই থেকে গড়ে প্রতি বছর ভারতীয় তুলা ইংলণ্ডে রপ্তানী হয় প্রায় ২১,৫৮২,৮৪৭ পাউণ্ড স্টার্লিং। ১৮৬১—৬৮ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে রপ্তানি ছিল ৯,২৬২,৮১৭ পাউণ্ড স্টার্লিং, আর ১৮৬৫—৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তা দাঁড়ায় ২৫,৫৩৪,১৭৯ পাউণ্ড স্টার্লিং।[১১]

ভারতে তুলো চাষের ফলে একদিকে যেমন ভারতীয় বণিকদের হাতে সংগৃহীত হল প্রভূত পুঁজি, অন্যদিকে ভারতে সুতাকলের সম্ভাবনার দ্বারা খুলে গেল।

ব্রিটীশ পুঁজির আঘাতের ফলে বাঙলা দেশে ভারতীয় ধনতন্ত্র-বাদের বিকাশে ব্যর্থ হলেও বোম্বাইতে তার বিস্তৃতি ঘটল। বণিক-পুঁজি শিল্পপুঁজিতে গোত্রান্তর হল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে ভারতীয় পুঁজিতে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হল। এঁর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কোয়াসজী নানা ভয় দাভর নামে জনৈক পার্শী। বোম্বাইতে ভারতীয় পুঁজিতে দ্রুত শিল্পায়ন ঘটতে থাকে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সারা ভারতে যেখানে ৫১টি মিল চালু ছিল; ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ১২৭টি।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে টাটা পরিবার মাদ্রাজে সুবৃহৎ সুতাকল স্থাপন করে শিল্পপতি হিসেবে আবির্ভূত হল। এ-সুতাকলটি কিভাবে গড়ে উঠলো টাটার জীবনরচয়িতা শ্রীহ্যারিস লিখেছেন: 'একটি মিলিটারী কণ্টাক্ট পেয়ে তিনি টাকা করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন ব্রিটীশ প্রজাকে আবিসিনিয়ার সরকার বন্দী করে। সেই বন্দীদের মুক্ত করতে অস্বীকার করায় আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটীশ গভর্নমেণ্ট আক্রমণ চালায়। এ ব্যাপারে জে. এন. টাটা যুদ্ধ দ্রব্যাদির কণ্ট্রাক্ট পায়। তা থেকে ৪০ লক্ষ টাকা মুনাফা হয়। সেই টাকায় ১৮৭৪-এ সেণ্ট্রাল ফ্যাক্টরী স্পিনিং ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী নামে

১১। **Bombay City Gazzeteer.**

একটি কোম্পানীর আবির্ভাব ঘটে। তার প্রাথমিক মূলধন ছিল ১৮ লক্ষ টাকা। নাগপুরের রাজার কাছ থেকে তিনি খুবই অল্পমূল্যে দশ একর জমি কেনেন।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী যেদিন রানী ভিক্টোরিয়া ভারত সম্রাজ্ঞী হিসেবে অভিষিক্ত হলেন সেদিন এ কোম্পানীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এবং মিলটির নামকরণ করা হয়, 'এম্প্রেস মিল।'[১২]

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলে রাশিয়া থেকে ইংলণ্ডে শন রপ্তানী বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ইংলণ্ডের চটশিল্পে গুরুতর সংকট দেখা দেয় এবং ক্রিমিয়া যুদ্ধের জন্যে এদেশে চটশিল্পের বিকাশের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দেয়।

ভারতে প্রথম চটশিল্প প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব জনৈক ব্রিটীশ নৌবিভাগের রাজকর্মচারীর। তিনি প্রথমে সিংহলে কফির চাষ শুরু করেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রিষড়ায় প্রথম চটকল স্থাপন করেন। সে যুগের 'রিষড়া ইয়ারন মিল' বর্তমানে 'ওয়েলিংটন জুট মিল' নামে পরিচিত। এ উদ্যোগের ফলে, ব্রিটীশ চট শিল্পের মালিকদের ভারতে কারখানা গড়ার ঝোঁক বেড়ে যায়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে ১৭টি মিল ছিল, ১৯০১-১০ খ্রীষ্টাব্দে তার সংখ্যা দাঁড়াল ৩৬টি।

শিল্প বিকাশের এ-সব প্রচেষ্টার অনেক আগেই ভারতে কয়লা খনির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথম কয়লা খনির খোড়ার কাজ আরম্ভ হয়। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এসব খনি হ'তে কয়লা সরবরাহ আরম্ভ হয়। ছয়টি খনি হতে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ৯০ টন কয়লা উত্তোলন হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৬০০০ টন। ১৮৪৬ সালে তা এসে দাঁড়ায় ৯১০০০ হাজার টন।

১২। **Life of J. N. Tata—Harris.**

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কয়লাখনি অঞ্চলে রেলপথ বিস্তৃতি ঘটে। রেলপথ সংযোগের ফলে কয়লা খনির কাজ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কয়লার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যেখানে ২৮৩,৪৪৩ টন, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ১,০০০,০০০ লক্ষ টন। কয়লা খনিতে ভারতীয় পুঁজির অনুপ্রবেশের চেষ্টা, ব্রিটীশ পুঁজির দ্বারা প্রতিহত হয়।

নতুন পরিবহন রাস্তা ও কয়লাখনির বিকাশের ফলে ভারতে শিল্পায়নের পথ উন্মুক্ত হলেও, তার গতি মন্থর। এখানে-সেখানে দু-চারটা কলকারখানা গড়ে উঠলেও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশ বিস্তৃত আকারে ঘটেনি। এসময়ে শিল্প বিকাশের কাজে ভারতীয় পুঁজির খুব বেশী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর উত্থানের জন্যে খুব বেশী আগ্রহান্বিত ছিল না এবং তার বিকাশের পথে সহস্র বাধার চেষ্টাও তারা করেছিল যে তার বিভিন্ন অন্তঃপ্রদেশ ব্যবসাবাণিজ্য, সেভিংস ব্যাঙ্ক ও এজেন্সী হাউসগুলির মাধ্যমে বিরাট ভারতীয় মূলধন নিয়োজিত ছিল। শিল্পকার্যে লগ্নী করার জন্যে ভারতীয় পুঁজি মজুত থাকা সত্ত্বেও ব্রিটীশ সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে সে কাজ অগ্রসর হতে পারেনি। এ অবস্থায় ভারতের জমিদার, ব্যবসায়ী ও ধনী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল।

ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ দেওয়ালের লিখন সঠিকভাবেই পড়তে পেরেছিল। নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন রাজনৈতিক চাল দিয়ে বসল সে। তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে সুচতুর ব্রিটীশ রাজকর্মচারী মিঃ হিউম সংযোগ স্থাপন করলেন।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, এমন একজন প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা থেকে জানা যায় যে, সিমলায় থাকাকালীন মিঃ

হিউম ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতেন। এ দেখা-সাক্ষাতের সময় একবার হিউম আগ্রহসহকারে বলেন যে, ভারতীয়দের রাজনৈতিক একতা ও পুনর্জীবন সাধন করার মধ্যে ব্রিটীশ জনমতকে প্রভাবান্বিত করা দরকার। ডাফরিন বলেন যে, এ-চেষ্টা ব্যর্থ হবেই। তিনি বলেন, বরং হিউম ভারতের মধ্যে এ রকম চেষ্টা করতে পারেন যাতে এখানকার লোকেরা তার নেতৃত্বে ও পরিচালনায় একটি জাতীয় সংগঠন গড়ে তুলতে পারে।

তবে হিউম-ডাফরিনের উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, ধনী বুদ্ধিজীবীরা হিউমের উদ্দেশ্যকে নিজ শ্রেণী-স্বার্থের জন্যে তারা কংগ্রেস সংগঠন গড়ে তোলায় সচেষ্ট ছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে বোম্বাইতে। সেই সময় বোম্বাই ছিল ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রধান কেন্দ্র। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডব্লু, সি, ব্যানার্জী। তিনি একজন ধনবান উকিল ছিলেন, তাঁর সঞ্চিত পুঁজি সরকারী কাগজে ও ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল। প্রথম কংগ্রেসে ফিরোজ মেহতা, দাদাভাই নৌরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি যোগদানকারী নেতারা সবাই ছিলেন ধনী বুদ্ধিজীবী। ধনী বুদ্ধিজীবীদের সঞ্চিত পুঁজি গচ্ছিত ছিল সরকারী কাগজে, ব্যাঙ্কে, শিল্পে-শেয়ারে। প্রকৃতপক্ষে এইসব বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি।

ইংরেজের আশীর্বাদে ও ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে কংগ্রেসের জন্ম হল।

হিউম সাহেব কংগ্রেসকে 'ইংরেজ শাসনের অনুগামী' নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনরূপে গড়ে তোলার জন্যে সচেষ্ট ছিলেন। লর্ড ডাফরিন কংগ্রেসকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—"কংগ্রেস হবে

ভারতের সম্রাজ্ঞীর স্থায়ী বিরোধী দল।" কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিউম সাহেবের ভাষায় বলা চলে, আন্দোলনের প্রাথমিক উৎসাহ যাঁরা দেন তাঁদের কাছে অন্য কোন পথ আর ছিল না। পশ্চিমী ভাব, শিক্ষা, আবিষ্কার, উপকরণ প্রভৃতির জোয়ার এত দ্রুত বেগে বইছিল যে তা একটি নিয়মতান্ত্রিক পথে উন্মুক্ত করে না দিতে পারলে তা ভিতরে ভিতরে ধূমায়িত হতে থাকবে।

কংগ্রেস গড়ার পেছনে মিঃ হিউমের যে-উদ্দেশ্য থাকুক না কেন, ইতিহাসের গতিপথে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখপাত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। এবং ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ইতিহাসের অস্ত্র হিসেবে এ-বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। যদিও কংগ্রেসের প্রথম দিকে ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্য রেখে এবং মৃদু সমালোচনা করে নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থ অনুযায়ী অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করার জন্যে অনেকে সচেষ্ট ছিল। প্রথম তিন বছরের কংগ্রেসের অধিবেশনগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, জমিদার শ্রেণী আর শিক্ষিত ধনী বুদ্ধিজীবী, এ-তিনের স্বার্থে প্রস্তাবাদি গৃহীত হ'ত। কিন্তু ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় আন্দোলন যদিও বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করেছিল, তা সত্ত্বেও এ-সময় থেকে জাতীয় কংগ্রেসের চারিদিকে জনগণের এক বিরাট সমাবেশ হয় যা, আগামী দিনে কংগ্রেসকে জনগণের মুখপাত্র হিসেবে পরিণত করার সুযোগ করে দিয়েছিল।

৬। বয়কট আন্দোলন ও শিল্প বিকাশের নতুন জোয়ার

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় আন্দোলনে বিলাতী দ্রব্যের বয়কটের যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল তা ব্রিটীশ বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত হানে এবং ভারতে নতুনভাবে শিল্প বিকাশের দ্বার খুলে যায়।

এ-বয়কট আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভারতে স্বদেশী শিল্প গড়ে তোলার দাবি উঠতে থাকে এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণী পত্র-পত্রিকায় ও বক্তৃতার মঞ্চে এ দাবি জোরদারভাবে উত্থাপন করলেন। বয়কট আন্দোলনের মধ্যে যেমন ভারতীয় জনগণের দীর্ঘ দিনের বিক্ষোভ তার বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রতীক হয়ে ওঠে তেমনি এ আন্দোলনের মধ্যে বুর্জোয়া জাতীয়বাদী নেতৃত্বে থাকায় তা দেশী শিল্পের নামে দেশী ধনতন্ত্রবাদের মুখ খুলে দেয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বয়কট আন্দোলন এবং স্বদেশী শিল্প গড়ে তোলার জন্যে দেশে সংগঠিত আন্দোলনের সূচনা হয় কিন্তু ভারতীয় সামাজিক জীবনে এ-নতুন ভাবধারা আমদানী আমাদের দেশে বহু পূর্বেই আত্মপ্রকাশ করেছিল।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের সুতোকল সঙ্কট মোচনে ভারতীয় তুলো একমাত্র ছিল সহায়। এবং ফলে ভারতে তুলোর চাষের প্রসারও হয়। সে-কারণে ভারতেই আধুনিক শিল্পায়ন প্রচেষ্টা হোক—এ দাবি করে তৎকালীন বাংলা সংবাদপত্র এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা 'স্বদেশের শিল্প ও বাণিজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা' নামে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখলেন, "সম্প্রতি রুশীয়ার শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির একটি উত্তম উপায় হইয়াছে। তত্রতৎ অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন রুশিয়ার তন্তুবায়দিগের কৃতবস্ত্র ভিন্ন অন্য দেশের বস্ত্র পরিধান করিবেন না। এতৎ প্রসঙ্গ ভারতবর্ষের কথা আমাদিগের স্মৃতি পথে আরূঢ় হইল। সমস্ত ইউরোপ খণ্ডে তুলার নিমিত্ত ভারতবর্ষের মুখ চাহিয়া আছে। প্রতি বৎসর আমাদিগের তুলার চাপ বাড়িতেছে। কিন্তু তন্মূলক আমাদিগের সৌভাগ্যের বৃদ্ধি হইতেছে কিনা, তাহা সমুদয় ভারতবর্ষবাসীর বিবেচনা করা কর্তব্য। আমার

প্রতিবাসী ধনবান হইলে আমি তাহার বাগানের মালী হইব। এই আশা আর আমরা মাঞ্চেষ্টারকে ভুলা দিয়া সচ্ছলে বস্ত্র পরিধান করিব, এই আশা সমান।...

"আমরা যদি যথার্থ স্বদেশহিতৈষী হইতাম, তাহা হইলে আমরা এ সুযোগ আমাদিগের দেশের সৌভাগ্যের প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিতাম। সে সৌভাগ্য কয়েকজন বিদেশীয় তন্তুবায়দের যত্ন ও স্বার্থসিদ্ধির উপরে নির্ভর করিতেছে, সে সৌভাগ্য কি সৌভাগ্য? আমাদিগের স্বদেশহিতৈষিতা থাকিলে আমরা মাঞ্চেষ্টার ও আমেরিকার উভয়কেই অতিক্রম করিতে পারিতাম। এদেশে তুলার কল হইলে কি পর্যন্ত না সৌভাগ্য হয়? চারিগুণ শুল্ক অধিক দিয়া কি অন্য কোন জাতি আমাদিগের সহিত সমান মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করিতে পারিতেন? এ দেশের বস্ত্র কি সুলভ হইত না? আমরা মধ্য-এশিয়ার বাণিজ্য একচেটিয়া করিতে পারিতাম না?...প্রতি বৎসর ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে ১৮ কোটি টাকা বস্ত্র আইসে। এই বস্ত্র যদি আমরা এ দেশে প্রস্তুত করিতে পারি, দেশের কি সৌভাগ্যই না হয়?...উপসংহার স্থলে আমরা স্বদেশীয় দিগকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিতেছি, গভর্ণমেণ্ট করুন আর না করুন তাঁহারা যে আর ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া না থাকেন।"[১৩]

স্বদেশী শিল্প গড়ে তোলার জন্যে তত্ত্বগত ভাবে বক্তব্য উপস্থিত হতে থাকল। ১৮৩৩-৩৬ খ্রীঃ কলকাতা থেকে ইংরেজীতে প্রকাশিত 'মুখার্জী ম্যাগাজীন'-এ ভোলানাথ চন্দ্র এক সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত প্রবন্ধ লিখলেন।[১৪] কিন্তু সক্রিয় আন্দোলনের গড়ে তোলার কৃতিত্বটুকু

১৩। সোমপ্রকাশ, ১২৭০ সন।

১৪। **A Voice for the Commerce and Manufactures of India —Bholanath Chandra.**

দাবি করতে পারেন পুণার গণেশ বাসুদেও যোশী।[১৫] ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জুনাতে এ-আন্দোলন সংগঠিত করেন। তিনি সরকারী কর্মচারী হওয়ার ফলে খুব বেশী দূর এগোতে পারেননি।

এ-আন্দোলনের পূর্বসূরী হিসেবে দাদা ভাই নৌরজী, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলন হঠাৎ কোন ঘটনা নয়। ইতিহাসেব গতিপথে এ আন্দোলন ছিল এক অনিবার্য পরিণতি। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী সঠিকভাবেই সে ভূমিকাকে পালন করেনি। তা সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থে এ-আন্দোলনও ছিল সীমাবদ্ধ একটি লক্ষ্য কিন্তু ভারতীয় জনগণ এ-আন্দোলনকে বিদেশী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হিসেবে গ্রহণ করে এক জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জনগণের জাতীয়তাবাদের নব চেতনায় উন্মেষ হল আর ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী সে-সুযোগে গড়ে তুলল বহু সংখ্যক শিল্প কারখানা।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মোট কারখানার সংখ্যা দাঁড়াল ২৬৮৮টি এবং এ-সময়ে সুতাকল শিল্পে সবচেয়ে বেশী অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ১৭৮টি সুতাকলে মোট পুঁজি নিয়োজিত ছিল, ১,০৭, ৬২,০০০ কোটি পাউণ্ড। অর্থাৎ এ সময়ে শিল্পে নিয়োগীকৃত ভারতীয় পুঁজির পরিমাণ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে দশগুণ বৃদ্ধি পায়। এবং জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানীর ৫৭,০০০,০০০ কোটি পাউণ্ডের মূলধন ভারতের শিল্পগুলিতে লগ্না ছিল তখন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় মূলধনে ৯টি আধুনিক ব্যাঙ্ক খোলা হয়।

১৫। The Swadeshi Movement—M. B. Sant. Report of the Twelfth Indian Industrial Conference.

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনে ভারতীয় বুর্জোয়াদের সবচেয়ে লাভ হল ভারতে ইস্পাত কারখানার প্রতিষ্ঠা; এবং ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়—যা জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে পরবর্তীকালে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করল। ব্রিটীশ কর্তৃপক্ষের বরাবরই এ লক্ষ্য ছিল, যাতে ভারতে ভারী শিল্প গড়ে উঠতে না পারে। অথচ ভারতে ভারী শিল্প গড়ে তোলার মত প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল। ভারতে খনিজ ঐশ্বর্য প্রচুর। তামা, সীসা, সোনা, লোহা এবং সব রকমের ধাতু ভারতের মাটিতে অপর্যাপ্ত।

পুরাকালে ভারতের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতির জন্যে লোহা ব্যবহৃত হত। প্রসিদ্ধ দামস্কাস তরবারী হায়দারাবাদের ইস্পাতে প্রস্তুত। দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ শিল্পদক্ষতার এক বিস্ময়। ১৫শ বছরের পুরানো ছয় টনের এত বড় একটা জিনিস সেই প্রাচীন যুগে কি করে ঢালাই হয়েছিল তা বিস্ময়ের বিষয়। অথচ ইংরেজ শাসকেরা এ দেশে ভারী শিল্প গড়ে তোলার কোন উৎসাহ দেখায়নি।

১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দুইজন ইংরেজ ফরকিউহার এবং মণ্টে ঝরিয়া জেলায় কামানের অংশ বিশেষ তৈরী করার জন্য অনুমতি পায়। দু'বছর কাজের পর তাঁদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ডানকানকে নিযুক্ত করেন মাদ্রাজে লোহার অনুসন্ধানের জন্যে। তিনি মাদ্রাজে ছোট একটি কারখানা স্থাপন করেছিলেন। ১৮৩৫ সালে জোসিয়া মার্শাল নামে জনৈক প্রাক্তন রাজকর্মচারী মাদ্রাজে এক ইস্পাতের কারখানা খোলেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশ সরকারের তত্ত্বাবধানে কুমায়ূন জেলায় লোহার অনুসন্ধানের কাজ সুরু হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সরকার ও ব্যক্তিগত মালিকানার তত্ত্বাবধানে দু'টি চুল্লী বসান হয়, কিন্তু জ্বালানীর অভাবে

এ-কাজ দ্রুত অগ্রসর হতে পারে না। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া আয়রন অ্যাণ্ড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁরা মাদ্রাজে কারখানার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কোম্পানীর দায়িত্ব সরকার নেয়।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। ভারতের অন্যতম পুরানো ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা জেসপ অ্যাণ্ড কোম্পানী ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বরাকরে লোহার অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ করে। কিছুদিন পরে তারা কাজ গুটিয়ে নেয়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার মেকাঞ্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী বীরভূম আয়রন ওয়ার্কস্ প্রতিষ্ঠা করে, রাণীগঞ্জের সন্নিকটে মহম্মদবাজারে তাদের কাজ আরম্ভ হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কোম্পানী প্রতিদিন দু'টন করে লোহা উৎপাদন করত। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্গার কয়লার অভাবের জন্যে তারা কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। ১৮৭৫ সালে বার্ন কোম্পানীর প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশে কয়লার সাহায্যে লোহা গলানোর এক প্রচেষ্টা হয়। এ-বছরেই আসানসোলে প্রতিদিন কুড়ি টনের লোহা উৎপাদনের এক পরিকল্পনা নিয়ে 'বেঙ্গল আয়রন কোম্পানী' তাদের কাজ শুরু করে। অর্থাভাবের ফলে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীটিও বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এ কোম্পানী সরকার গ্রহণ করে নেয়। আট বছর পর্যন্ত এ-কোম্পানীকে সরকার চালু রাখে। এ কারখানার দু'টি ব্লাস্ট ফার্নেস এবং একটি ফাউন্ড্রী ছিল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার মার্টিন অ্যাণ্ড কোম্পানী এটি ক্রয় করে এবং তারা বেঙ্গল আয়রন অ্যাণ্ড কোং নাম দিয়ে কাজ শুরু করে। বর্তমানে ঐ কারখানা ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং নামে পরিচিত। ভারতে এটিই প্রথম ইস্পাত কারখানা।

এসব উদ্যোগপর্বগুলি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে আনলেও ব্রিটীশ শিল্পপতিরা ভারী শিল্প গড়ার কাজে উৎসাহ দেখালো না। আর ভারতীয় শিল্পপুঁজি তখন এমন শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি যে, এ কাজে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় বুর্জোয়ারা কাপড়ের কলগুলি থেকে প্রভুত মুনাফা সঞ্চয় করে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করে নেয়।

সে-সময়ের সবচেয়ে বড় সুতো কলের মালিক জে, এন, টাটা ভারতে প্রথম ভারী শিল্প 'টাটা আয়রন ওয়ার্কস' প্রতিষ্ঠা করে। তিনি যখন এম্প্রেস মিলের কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, তখন থেকেই খনিজ দ্রব্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ হয়। কিন্তু তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা খুব বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। এটি সম্ভব হল যখন বাঙ্গালী ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু নিঃস্বার্থভাবে এ-কর্মকাণ্ডের পেছনে নিজেকে জড়িয়ে নিলেন। প্রমথনাথ বসু যে খনিজ দ্রব্যের সন্ধান দেন তার ফলেই টাটা কারখানা গড়ে ওঠে। ভারতে ভারী শিল্প বিকাশের ইতিহাসে প্রমথনাথ বসুর নাম অবস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ শিল্প গড়ার পেছনে আর একজনের কর্মপ্রয়াস উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন সাপুরজী শকত্‌ওয়ালা। শকত্‌ওয়ালা পরবর্তীকালে ব্রিটীশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন এবং পরে তিনি ব্রিটীশ পার্লামেন্টের সদস্য হন। তিনি ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক বিশেষ অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। টাটা কারখানা গড়ার প্রাথমিক কাজ সম্ভব হলেও, অর্থের জন্যে জে, এন, টাটাকে বিলেতে ধরনা দিতে হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটীশ শিল্পপতিদের কাছে তিনি প্রত্যাখ্যাত হন।

ভারতবর্ষে তখন স্বদেশী যুগের অধ্যায় চলেছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশে এক বিরাট জাতীয়

অভ্যুত্থানের সূচনা হয়। বিদেশী জিনিস পোড়ানো ও বর্জনের প্রচণ্ড জোয়ার সারা দেশ ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় শিল্প ভারতবাসীরাই গড়ে তুলবে—সারা দেশে তখন একমাত্র আওয়াজ।

অর্থের জন্যে এক বছরেও বেশী সময় ইংলণ্ডে অতিবাহিত করে টাটা শূন্যহাতে দেশে ফিরে এলেন। টাটা দেখলেন, দেশবাসী চাইছে দেশে শিল্প গড়ে উঠুক। এ সুযোগ টাটা গ্রহণ করে এক অভিনব ফাঁদ পাতলেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট মূলধনের জন্যে টাটা দেশবাসীর কাছে এক আবেদন পত্র পেশ করলেন। সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত টাটাদের বোম্বাই অফিসে দারুণ ভীড়। মূলধন নিয়োগকারী দেশবাসী এসেছেন দলে দলে—যুবক ও বৃদ্ধ, ধনী এবং গরিব, মেয়ে ও পুরুষ। সবাই এসেছেন নিজেদের সামর্থ্য নিয়ে। দেখতে দেখতে মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে সমগ্র মূলধন (১৬,৩০,০০০ পাউণ্ড) সংগৃহীত হয়ে গেল আট হাজার ভারতীয়দের কাছ থেকে।[১৬]

সাঁকচীতে কারখানার স্থান নির্বাচন করে প্ল্যাণ্ট নির্মিত হল এবং মেসার্স টাটা অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড ম্যানেজিং এজেণ্ট নিযুক্ত হলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্ল্যাণ্টের কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে লোহার উৎপাদন শুরু হয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮,৫৪,৫৮৩ টাকা।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের সুরু। এ যুদ্ধের পর থেকে ভারতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেমন দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে তেমনী ভারতীয় বুর্জোয়া শক্তির বিকাশ এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তার সংযোগের আর এক নয়া অধ্যায়ের সৃষ্টি হল।

১৬। **Life of J. N. Tata—Harris.**

এক দিকে প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে ব্রিটীশ সরকার চাপে পড়ে তাদের অনুসৃত নীতি পাল্টাল, তেমনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সন্ত্রাসবাদ, ১৯০৮ খ্রীঃ বোম্বাইতে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট এবং ১৯১৭ খ্রীঃ রুশ বিপ্লবের প্রভাবে ভারতীয় জনজীবনে এল এক নতুন আন্দোলনের প্রবাহ। ফলে, জাতীয় কংগ্রেসের আপোসমুখো মনোভাব পরিত্যাগ করে, ভারতের জনগণের সংগ্রামী নেতা তিলকের নেতৃত্বে কংগ্রেসে তখন গরম নীতি অবলম্বন করল। এরকম এক স্ফুলিঙ্গের মুখে ব্রিটীশ সরকার কিছুটা নরম নীতি গ্রহণ করল।

যুদ্ধের অবস্থার চাপে ও ভারতীয় জনগণের অভ্যুত্থানের ভয়ে ব্রিটীশ সরকার ভারতীয় শিল্পপতিদের প্রতি—সহৃদয়ের হাত সম্প্রসারিত করে। যুদ্ধের ফলে ভারতীয় বুর্জোয়াদের সামনে এক নতুন সুযোগ আসে। এ-সময়ে ইংলণ্ডের কলগুলি যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে ব্যস্ত। কাজেই তাদের পক্ষে ভারতের বাজারে মাল যোগান দেওয়া আগের মত সম্ভব ছিল না। ঠিক এ সুযোগে জাপান ভারতের বাজারটি দখলের মতলবে ছিল। সুচতুর ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদীরা একঢিলে তিনটি পাখি মারলেন। এতকালে যে ব্রিটীশরা ভারতীয় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের নিত্য নতুন বাধা সৃষ্টি করেছিল, তারাই ভারতীয় পুঁজিকে সম্প্রসারণ করে দেওয়ার জন্যে কিছু জায়গা ছেড়ে দিল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে মুক্তি ও স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে ঘোষণা করে কংগ্রেস ও বুর্জোয়ারা ব্রিটীশের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য হাত প্রসারিত করল। এ-ভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেওয়া হল। যুদ্ধকে সমর্থন করে বুর্জোয়ারা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিল না, ব্রিটীশ সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্যে সক্রিয় ভূমিকা করল তারা। এবং যুদ্ধ তহবিলে ৩০০,০০০,০০৭ কোটি পাউণ্ড উপহার দিয়ে সাম্রাজ্য-

বাদের পাশে দাঁড়িয়ে ফুলশয্যার রঙ্গীন স্বপ্ন দেখতে লাগল। আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও তাদের কিছু কিছু সামান্য আবদার মেনে নিয়ে সুতী দ্রব্যের ওপর রপ্তানী শুল্ক কমিয়ে দিল।

ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী বিকাশমান জাতীয় আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধের সুযোগে নিজেরের শক্তি বাড়িয়ে নিল— এ ইতিহাস আজ বলে সেদিনের দিনগুলো।

১৯১০-১৯১৪ সালে গড়পড়তা রেজিষ্ট্রীকৃত সামগ্রিক মূলধন, আনুমানিক ছিল ১২০০০,০০০ পাউণ্ড। ১৯১৭-১৮ সালে এ অঙ্ক গিয়ে দাঁড়ায়—১৮০০০,০০০ পাউণ্ড। এর পরবর্তী দু'বছরে, যুদ্ধ শেষের পরবর্তী দু'বছরে এ অঙ্ক ফেঁপে উঠে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৮৩,০০০,০০০ এবং ১০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড।[১৭]

যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় পুঁজিতন্ত্রের জন্যে ব্রিটীশ সরকার যে স্থানটুকু ছেড়ে দিয়েছিল, তাতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মূল ঔপনিবেশিক চরিত্রটির পরিবর্তন হয়েছিল মনে করলে ভুল করা হবে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটীশ পুঁজি ভারতীয় পুঁজিকে কোণঠাসা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। যুদ্ধের চাপে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ কংগ্রেসকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা তারা রাখেনি।

এখান থেকে শুরু হল, ভারতের জাতীয় জীবনের আর এক নতুন অধ্যায়। সে-কথা পরে।

১৭। **India in Transition—M. N. Roy**

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে এক নতুন শিল্প-ব্যবস্থার উদ্ভবের সঙ্গে সমাজে এক নতুন শ্রেণীর জন্ম নিল। এই নতুন শ্রেণীটি হ'ল—শ্রমিক শ্রেণী।

ব্রিটীশ উপনিবেশবাদীরা ভারতে কুটিরশিল্প ধ্বংস করে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে, জমিদারদের জমির মালিক ও জমি হতে কৃষককে উচ্ছেদের আইনসঙ্গত বিধিব্যবস্থা সৃষ্টি করে সারা ভারতে এক বিরাট 'ভাসমান জনসমষ্টি'র সৃষ্টি করে। সমাজের এ অংশের লোকেরা 'পাবলিক ওয়ার্কস'-এর রাস্তাঘাট নির্মাণ, বাঁধা-খাল তৈরী ও রেলওয়ের কাজে প্রথম মজুরি-উপার্জক হিসাবে আবির্ভূত হয়। এ শ্রেণীকে ভারতের আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর পথিকৃৎ বলা চলে।

উপনিবেশবাদীরা একটা দেশের পুরানো শিল্প সম্পদ শুধু ধ্বংসই করে না—সে উপনিবেশে এমন এক বিরাট ভাসমান জনসমষ্টিও সৃষ্টি করে যাদের দিয়ে তাঁরা অন্য উপনিবেশে শোষণ করার জন্য যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। ব্রিটীশ উপনিবেশবাদীদের এ পরীক্ষার নিরীক্ষার ঘাঁটি হল ভারত।

জমিজমা হস্তচ্যুত ও কুটিরশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে উদ্ভূত বিরাট সংখ্যক 'উদ্বৃত্ত' মানুষগুলিকে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদীরা সে কাজে ব্যবহার করল।

এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ব্রিটীশরা তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলছিল। এ-সব দেশে তারা বিভিন্ন বাগিচা শিল্পের পত্তন করে। এ-সব বাগিচা শিল্পগুলিতে দাস-ব্যবসা ও দাস প্রথার সাহায্যে বিভিন্ন দেশ থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করে শিল্পের উৎপাদন চালু করা হত। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে দাস-ব্যবসা এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দাস প্রথা লোপ পায়। যার ফলে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ-গুলিতে শ্রমিকের অভাব ভয়াবহরূপে দেখা দেয়। এ শূন্য স্থান পূরণ করার জন্যে ব্রিটীশ উপনিবেশগুলিতে ভারতীয় শ্রমিক সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি ব্রিটীশ উপনিবেশবাদীরা ধনতন্ত্রবাদীদের জন্যে কি ভাবে একদল 'উদ্বৃত্ত' মানুষ ভারতে তৈয়ারী করে রেখেছিল। ধনতন্ত্রবাদীদের শোষণ-প্রয়োজনে একদিন সে 'উদ্বৃত্ত' মানুষকে দেশান্তরে পাড়ি দিতে হয়।

উপনিবেশে মোটামুটি ভাবে বলা চলে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই বিভিন্ন ব্রিটীশ-বাগিচার জন্যে ভারতীয় শ্রমিক পাঠানো শুরু হয়। কিন্তু ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই এ-শ্রমিক পাঠানোর হার ভয়াবহ ভাবে বেড়ে যায়। দাস প্রথার বিলুপ্তির পর ব্রিটীশ বাগিচা শিল্প মালিকেরা শ্রমিকের জন্য তারস্বরে চিৎকার করতে শুরু করে। ১৮৪২ ও ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটীশ সরকার এক পার্লিয়ামেণ্ট কমিটি গঠন করে, প্রথম কমিটি রিপোর্টে জানা যায় যে, 'নিগ্রোদের স্বাধীনতা দানে উৎপাদন বিঘ্নিত হয়েছে।' এ কমিটি আরও উল্লেখ করে যে, 'উৎপাদন হ্রাস জনিত গুরুতর কারণ সম্পর্কে মূলতঃ······মজুর সংগ্রহ হ্রাসের অজ্ঞতাই বাগিচা মালিকদের হয়েছে। এ অবস্থায় ভারতবর্ষই ছিল শ্রমিক সংগ্রহের উপযুক্ত স্থান। সুতরাং এতে আর আশ্চর্য কি যে, মজুরের মজুত ও সংগ্রহের জন্যে উপনিবেশগুলো ভারতের মাটির দিকেই খোঁজ করবে যেখানে বর্ধমান জনসংখ্যা বাগিচার

কাজের জন্য আবেদনপত্র নিয়ে যেন দাঁড়িয়েছে।' গোড়ার দিকে কি হারে ভারতীয় শ্রমিক সংগ্রহ করা হত তার এক বিবরণ থেকে জানা যায়—১৮৩৪ এবং ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সাত হাজার মানুষ কলকাতা থেকে মরিসাশ অভিমুখে যাত্রা করে। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে দু'টো জাহাজে চারশত দেশত্যাগী মানুষ ব্রিটীশ গায়না অভিমুখে রওয়ানা হল। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিনিদাদ অভিমুখে প্রথম শ্রমিকদল যায়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জ্যামাইকাতে প্রথম ভারতীয় যায়। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চার হাজার মানুষ এ উপনিবেশে পৌঁছাল। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নাটালে প্রথম একদল গেল। গ্রাণ্ডা, সেণ্ট লুনিকা এবং সেণ্ট ভিণ্ডিতে যথাক্রমে ১৮৫৬, ১৮৫৮ এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে গিয়ে ভারতীয় শ্রমিকেরা পৌঁছাল।

প্রশ্ন জাগা : এরা কি স্বাধীন শ্রমিক ছিলেন ?

"বিভিন্ন উপনিবেশে শ্রমিকদের পাঠাবার ব্যাপারটা বিনা বাধায় বা ঝামেলায় সম্পাদিত হয়েছে ভাবলে হয়তো ভুল করা হবে। দাস প্রথার বিরোধী মানুষেরা শ্রমিক-পাঠানোর ঘটনাকে সন্দেহের চোখে দেখত। তারা এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। প্রথাগত দাস বিরোধী আন্দোলনের নেতা শ্রীনোয়েল বাকস্টন ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন, মরিসাশ বা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে সব-ভারতীয়কে চালান দেওয়া হত তারা ছিল যেন দাসদের মত।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, এ ভারতীয় শ্রমিকেরা স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে যেত না। এদের জোর করে একটা চুক্তিপত্রে সর্ত করিয়ে নিয়ে তারপর পাঠালে হত। এ-সময় থেকেই ভারতে এক নতুন ধরনের শ্রমিকের উদ্ভব হয়।

আমাদের দেশে প্রথম মজুরি, উপার্জক শ্রেণী হল এ শ্রেণীর শ্রমিক। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশান্তরী শ্রমিকদের রক্ষার জন্যে

আইনগত কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু অবস্থা বিশেষে এক-একটা আইনগত ব্যবস্থা করার প্রয়োজন দেখা দিল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার একটি আইন পাশ করে। এটাই ভারতে প্রথম ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট। আইন পাশ হলেও, এ আইন শ্রমিকদের রক্ষাকবচ না হয়ে, ইমিগ্রেশন অ্যাক্টের আবরণের নীচে নতুন করে আবার এক ধরনের দাস প্রথা চালু করা হল।

যে সমস্ত ভারতীয় শ্রমিক উপনিবেশগুলিতে উপার্জক শ্রেণী হিসেবে নিযুক্ত ছিল তাদের ভয়াবহ জীবনযাত্রার কথা এদেশে প্রায় অজানা ছিল। পরে এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতে তীব্র আন্দোলন সংগঠিত হয়। বাঙলা দেশ এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। আন্দোলনের চাপের ফলেই এ-আইন পাশ করতে ব্রিটীশ সরকার বাধ্য হয়েছিল। ব্রিটীশ সরকার দেখাবার চেষ্টা করেছিল যে, তাঁরা 'দেশান্তরী' আটকাবার জন্যেই যেন আইনটি তৈরি করেছেন। কিন্তু আসলে ঔপনিবেশিক শোষণের অর্থনীতি বিকাশ এবং ভারতে ব্রিটীশ ধনতন্ত্র বিকাশের জন্যেই যে সস্তা মজুরের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, আইনত এটাই ছিল তার একটি নতুন ব্যবস্থা।

এ আইনের পরে কি হারে উপনিবেশগুলিতে শ্রমিক পাঠানো হয়েছিল, মরিসাশের হিসাব উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে।

বৎসর	পুরুষ	মেয়ে	মোট
১৮৫১	৬৪,২৮২	১৩,৭১৪	৭৭,৯৯৬
১৮৬১	১৪১,৬১৫	৫১,০১৯	১৯২,৬৩৪
১৮৭১	১৪১,৮০৪	৭৪,৪৫৪	২১৬,২৫৮
১৮৮১	১৫১,৩৫২	৯৭,৬৪১	২৪৮,৯৯৩
১৮৯১	১৪৭,৪৯৯	১০৮,৪২১	২৫৫,৯২০
১৯০১	১৪৩,১০০	১৫৫,৯৮৬	২৫৯,০৮৬

বৎসর	পুরুষ	মেয়ে	মোট
১৯১১	১৩৮,৯৭৪	১১৮,৭২৩	২৫৭,৬৯৭
১৯২১	১৩৯,১৫০	১২৬,৩৭৪	২৬৮,৫২৪

এ-সব দাস শ্রমিকদের কিভাবে নিয়োগ করা হত এবং কি অবস্থার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের বিদেশে নিয়ে যাওয়া হত, তার ইতিহাসের মধ্যে আছে ভয়াবহ ঘটনা আর করুণ কাহিনী।

ইউরোপীয় শ্রমিক নিয়োগ সংস্থা থেকে আড়কাঠিদের নিয়োগ করা হত, তারা সারা দেশ জুড়ে ঘুরে বেড়াত আর খোঁজ করত হতভাগ্যদের—কখন গ্রামাঞ্চলের পুরুষ ও নারীদের কাছ থেকে চুক্তিপত্রে সই করিয়ে নেওয়া যায় এ-ছিল মতলব। ছলে বলে কৌশলে, একবার চুক্তিতে সই করিয়ে নিতে পারলেই তাদের কলকাতায় এনে ফেলা হত। যতদিন না উপনিবেশে পাঠানো হয় ততদিন কড়া পাহারায় তাদের কলকাতায় রাখা হ'ত। সমুদ্র-যাত্রার ব্যবস্থাটিও কিছু ভাল ছিল না। জাহাজের কোন নিয়ম-কানুন এদের বেলায় থাকত না. ফলে, বলতে গেলে প্রতি জাহাজেই কোন না কোন হতভাগ্যদের প্রাণ যেত।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এক তদন্ত কমিশনের সামনে উপস্থিত সাক্ষ্য থেকে এ সম্পর্কে অনেক ঘটনার কথা জানা যায়। সে-সব সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, জাহাজে ৩০০ লোকের জায়গা থাকলে ৩৬৬ জনকে তোলা হত। তাদের দিনে-রাতে একবার মাত্র খাবার জুটত। এবং উপনিবেশে পৌঁছে তারা বুঝতে পারত, কি ভুল তারা করেছে। যে পেটের তাগিদে আসা, সে পেটে এখানেও আকাল। তার ওপর এক পয়সা মাইনেও জুটত না। দু-একটি সাক্ষ্যের কথা এখানে উল্লেখ করা হল।

সোপিয়া জাহাজের স্কীপার ক্যাপ্টেন র‍্যাম্সন'কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, জাহাজে খুব বেশী ভিড় ছিল কি?

উত্তর: আমার মনে হয়, সাধারণত যে লোক থাকার নিয়ম. তার চেয়ে বেশী ছিল সেটায়। আমার মনে হয়, তিনশত লোক যথেষ্ট। কিন্তু কার্যত সেখানে ৩৬৬ জন লোক তোলা হয়। তার মধ্যে দু'জন ডেক থেকে পড়ে যায় আর আট জন বোর্ডেই মারা যায়।

আর একটি জাহাজের স্কীপার ক্যাপ্টেন এ· জি· ম্যাকেঞ্জিকে জিজ্ঞাসা করা হয়: ক'বার করে দেশান্তরীরা দিনে খেতে পেত?

উত্তর: একবার।

প্রশ্ন: মরিসাসে কুলিদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা হত, সে সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কি?

উত্তর: আমি শুনেছি সেখানে তাদের সঙ্গে ব্যবহার ছিল জঘন্য। তারা তাঁদের পুরো মাইনে পর্যন্ত পেত না। একজন তো আমার কাছে অভিযোগ করেছেন যে, ১৮ মাস ধরে এখানে সে এসেছে কিন্তু একবারও মাইনে পায়নি।*

এ কন্‌ট্রাক্ট ব্যবস্থা বহুদিন পর্যন্ত টিঁকে ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন কারখানা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে—তখনও শ্রমিক নিয়োগের এ-পদ্ধতি চালু ছিল। এমনকি সরকারী কোন কোন বিভাগেও এ ব্যবস্থাতেই শ্রমিক নিয়োগ করা হত।

এখন বলা যায় যে, পরবর্তীকালে ভারতে যে কারখানা-শ্রমিকদের দেখা গেছে তাদের পটভূমিকা ছিল সেই একই অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থা, যে বলি দিয়েছিল 'দেশান্তরী' শ্রমিকদের। এর কার্যত দু'ধরনের শ্রমিকদের চারিত্রিক অবস্থিতি ছিল দীর্ঘকাল।

* 'ট্রেড ইউনিয়ন' (গোপাল ঘোষ সম্পাদিত, অধুনালুপ্ত মাসিক পত্রিকা)-এর সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ সনের সংখ্যার শ্রীসনত বসুর প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।

তেমনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সে যুগের পটভূমি পর্যালোচনা করলে ভারতীয় শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের কতকগুলো বিশেষ বিশেষ চরিত্র বুঝতে আজ আমাদের সাহায্য করে।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ব্রিটীশ পুঁজিতে ভারতে বাগিচা শিল্প গড়ে ওঠে। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদীরা ইনডেনচার শ্রমিক নিয়োগ করে এ শিল্প চালু করে।

চা-বাগিচা শিল্পের মালিকদের জন্যে ইনডেনচার শ্রমিকদের ব্যবস্থা যেমন ছিল, তেমনি ব্রিটীশ সরকার ওয়ার্কস মেনস-ব্রিচ-অফ্ কনট্রাক্ট অ্যাক্ট তৈরী করে দিয়ে আরও সুযোগ করে দেয়। এবং ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের সাহায্যে উপরোক্ত আইন শ্রমিকদের ওপর প্রয়োগ করত। এ কায়দার আড়ালে তারা ভারতে দাস শ্রমিক প্রথা বহাল রাখে। এমনকি ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোন কোন জায়গায় এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, এ ব্যবস্থা তখনও টিকে ছিল।

ব্রিটীশ উপনিবেশবাদীদের স্টীম রোলারে বাঙলা দেশের পুরানো সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যেমন ধ্বংস হয়—তেমনি সরকারের প্রবর্তিত নতুন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে সামন্ততন্ত্র নতুন জীবন লাভ করে। ফলে সারাটা দেশ জুড়ে এক 'ভাসমান' জনসমষ্টির সৃষ্টি হয়। এ ভাসমান জনসমষ্টিই আসাম এবং বিভিন্ন উপনিবেশে বাগিচা শিল্পের শ্রমিকে পরিণত হয়। কি ভাবে আসামে চা-বাগিচার জন্যে শ্রমিক সংগ্রহ করা হত তার এক প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮৬৩ সালের জুন মাসে 'ঢাকা প্রকাশ' বাংলা সংবাদদাতার এক বিবরণ প্রকাশ করে। সংবাদদাতার সঙ্গে রূপচাঁদ বিশ্বাস নামে একজন শ্রমিকের সাক্ষাৎ হয়। রূপচাঁদ রিপোর্টারকে বলেন যে, সে নদীয়া জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের অধিবাসী। সে বলে, কলিকাতার এক সাহেব কাছাড় চা-বাগিচার জন্যে শ্রমিক সংগ্রহ করত। "গোবিন্দ

বাবু, কৃষ্ণ নাপিত এবং রামকিশোর যোগী, এই তিন ব্যক্তি তাঁহার সাহায্যকারী।……ইহারা সর্বত্র এইরূপ ঘোষণা করিয়া বেড়ায় লিখন পঠনানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা কাছাড়ে গমন করিলে মাসিক ১০/১২ টাকা বেতন পাইবে, তাহাদিগকে মজুরের কাজ করিতে হইবে। যাঁহারা লেখা পড়া জানেন, তাঁহারা অন্যূন ১৬/১৭ টাকা বেতন পাইবেন; তাহাদিগকে হিসাব পত্রাদি লিখিতে হইবে।"

"এই প্রলোভনে পড়ে রূপচাঁদ বিগত পৌষ মাসে কাছাড় অভিমুখে যাত্রা করেন। অনন্তর পথিমধ্যে নানারূপ ক্লেশ ভোগ করিয়া একমাস পর…চা-বাগিচায় এসে পৌঁছে।

"রূপচাঁদ চা-বাগিচা এসে কি দেখলেন: অনেক ভদ্র সন্তানও মজুরের কাজ করিতে করিতে অস্থিচর্মসার হইয়া যাইতেছেন। দেখিয়া তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। তাহার কাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে সে জানিতে পারিল, এখানে বনকাটা, গাছকাটা এবং মাঠ কোপান ব্যতীত আর কাজ নাই। তোমাকে তাহাই করিতে হইবে।

"রূপচাঁদ কোন এগ্রিমেণ্ট করে আসে নাই! সে যখন চা-বাগিচা ছাড়িয়া চলে যাইতে চাইল, ইংরেজ মালিক রষ্টন তাহাকে বলিলেন তোমাকে কাজ করিতে হবে, এই ভাবে তিন মাস জঙ্গলে কাজ করিতে হইল। অবশেষে রষ্টন সাহেবের অনুমতি নিয়া…সে ঢাকায় আসে।…পথ খরচার দু টাকা তাহাকে দেওয়া হয়।

"রূপচাঁদ বলে, "চাকরগণ কুলিদিগককে যৎপরনাস্তি প্রহার করিয়া থাকেন। কুলিদিগকে ১০/১২ টাকা বেতন প্রদানের কথা বলিয়া কাছাড়ে লইয়া যাওয়া হয়, বাস্তবিক শেষে তাহারা ২৷৩ টাকার অধিক বেতন পাইত না। কুলিদিগকে সচরাচর যে সকল দ্রব্য আহার করিতে দেওয়া হয় তাহা গো অশ্ব প্রভৃতি পশুগণেরও আহার-যোগ্য

নহে। অথচ এই আহারীয় দ্রব্যের নিমিত্তে কুলিদিগের বেতন হইতে মাসে দুই দুই টাকা কাটিয়া লওয়া হয়।

"আহার ও বাসস্থানের ঈদৃশ্য অপকৃষ্টতা নিবন্ধন কুলিদিগের মধ্যে অনেকেই উৎকট উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহাদিগের যথোচিত চিকিৎসা করাও হয়না। যেমন পীড়া হয়, অমনি পচিয়া গলিয়া মরিয়া যায়।

"চা-করগণ যে সকল অত্যাচার করেন, তাহার আর বিচার হইতে পারে না। কারণ, যে যে মহাপুরুষের প্রতি কাছাড়ের শান্তিরক্ষা ও বিচারের ভার অর্পিত রহিয়াছে, তাহারা প্রায় সকলেই চা-করগণের সপক্ষ, কেহ কেহ স্বয়ংই চা-কর।...

"তাহারা ঠিক নির্বাসিতগণের তুল্যাবস্থ। তাহারা যে দিবস কাছাড় রূপ মহাকারাগারে অবরুদ্ধ হইয়াছেন, তদবধি তাহাদিগকে স্নেহময় পরিজনের প্রিয় সংবাদাদি শ্রবণ জনিত নির্মল সুখে এক কালেই বঞ্চিত হইতেছে। তাহারাও পরিজনকে আত্মসংবাদ জ্ঞাত করাইতে পারে না। কারণ চা-করগণ কাছাড়ের পোষ্ট অফিসের ক্ষমতা স্বহস্তগত করিয়া লইয়াছেন, কুলি প্রভৃতি স্ব স্ব পরিজনের নিকট যে সকল পত্র লেখে অথবা পরিজনবর্গ তাহাদিগের নিকট যে সকল পত্রাদি পাঠায়, তাহা কাছাড়ের পোষ্ট অফিসের ভিত্তিতেই লয় পাইয়া যায়।[১]..."

আসাম ও কাছাড় জেলার জন্যে কলকাতা থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করে পরে জাহাজ করে তাদের যে অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হত তার এক বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে "রিফর্ম" পত্রিকায় সে বিবরণ প্রকাশিত হয়।

১। সোমপ্রকাশ, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ।

'রিফর্মা'য় যে জাহাজখানির কথা লেখা হয়েছিল তাতে ৪৫৪ জন শ্রমিক তোলা হয়েছিল। "তাহদিগের প্রত্যেককে ১॥০ হস্ত মাত্র স্থান শয়ন আসন উপবেশন ও ভ্রমণ প্রভৃতি সমুদয় কার্য নির্বাহ করিতে হয়। ধোলাই পীপার-ন্যায় উহার স্কন্ধে ও উহার বক্ষে, অমুক স্ত্রীলোক অমুক পুরুষের ক্রোড়ে, অমুক পুরুষ অমুক স্ত্রীলোকের পদতলে পড়িয়া থাকে। কেহ উঠিয়া দাঁড়াইলে জাহাজের কাপ্তেনও তৎক্ষণাৎ ক্রোধন্ধ হইয়া লাথী ও বেত্রাঘাত করিয়া বসাইয়া দেন। ফলতঃ তাহাদিগের জীবনের প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্রও দৃষ্টি রাখা হয় না।"

এ-ছিল শ্রমিক সংগ্রহের এক দিকের চিত্র। আগেই বলেছি, শ্রমিকদের কয়েদ করে রেখে কাজ করানো যেতে পারে এমন এক আইনতঃ ব্যবস্থা আগে থেকে করে রাখা হয়েছিল। এ-'আইনতঃ ব্যবস্থা' কেমন ছিল?

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আসামের চা-শ্রমিকদের এক অভ্যুত্থান হয়। শ্রমিক আন্দোলনের চাপের ফলে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে একটি তদন্ত কমিশন বসে। ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দের এ-কমিটি শ্রমিকদের কাজের সর্ত-ভঙ্গ আইন নিয়ে পর্যালোচনা করে। এ-আইনে ('ওয়ার্কস্ মেনস ব্রিচ অফ্ কনট্রাক্ট' অ্যাক্ট) আছে যে, যারা সর্ত ভঙ্গ করবে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী বিধিমত শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে। ফৌজদারী কোর্টের মামলাগুলো থেকে দেখা যায় যে, মাত্র চার টাকা অগ্রিম দিয়ে অনেক শ্রমিককে ৯৩৯ দিনের জন্য চুক্তিবদ্ধ করে জোর করে কাজ করে নেওয়া হয়েছে। এমনও ঘটনা আছে যে, সর্তের দিনের কিছু পূর্বে যদি কোন শ্রমিক কাজ করতে অস্বীকার করত তবে তাকে কঠিন সাজা দেওয়া হত। একজন নারী শ্রমিক নানা কারণে তার সর্ত-নির্দিষ্ট দিনের ২৭ দিন পূর্বে জানায় যে, সে আর কাজ করতে পারবে না। ফলে তার ভাগ্যে জোটে দু'সপ্তাহ সশ্রম

কারাদণ্ড। শুধু নারীরা নয়, শিশুরা পর্যন্ত রেহাই পায়নি। এক জেলার শতকরা পাঁচভাগের মামলা ছিল এ-ধরনের এবং তা-ও আবার শিশু শ্রমিকদের বিরুদ্ধে।

একজন এ-শ্রমিক কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেবার সময় জানায়, "একবার সর্তের টাকা নিলে আর রেহাই নেই। আমি যদি চলে যাই, চৌকিদার আমাকে ধরে আনবে।" আর একজনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: সে ইচ্ছা করলেই বাগান থেকে চলে যেতে পারে কি না? তার জবাবে সে বলে, "ম্যানেজার ও চৌকিদার আমাদের আটকে দেবে। চৌকিদার আমাদের পাহারা দেয় এবং মারে। সারা রাত্রে তারা বাতি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং অনেক সময় দরজা খুলে দেখে আমরা ঘরে আছি কিনা।"

এ-ভাবেই ভারতের 'ভাসমান জনসমষ্টি' শ্রেণী এক তীব্র শোষণ ও নিষ্পেষণের মধ্যে দিয়ে ক্রমবিকাশের পথে শিল্প-শ্রমিকের গোত্রান্তর হল।

তৃতীয় অধ্যায়
শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয়

ক। শ্রমিকশ্রেণীর চেতনার বিকাশ

অতীতের গিল্ড-এর কারুশিল্পের অর্থনীতির মধ্যে শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ ছিল তার সঙ্গে বর্তমানকালের শ্রমিক সংগঠনের কিছু কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপের মধ্যযুগে যে সব গিল্ড ব্যবসায়ী ছিল তার সঙ্গে তুলনা করলে পূর্বের গিল্ড ব্যবসায়ীরও ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায়।[1]

যৌথ উন্নয়নের জন্যে বিভিন্ন জীবিকার মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগে এসব গিল্ড ছোট ছোট স্বাধীন সংগঠনগুলো গড়ে উঠত।

ইংলণ্ডের ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গ্রেটবৃটেনের প্রাচীন গিল্ড ব্যবস্থার মধ্যে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের বীজ নিহিত ছিল। অনুরূপ ভাবেই ভারতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে ধরনের গিল্ড ব্যবস্থার প্রচলন ছিল তার মধ্যে কারিগর শ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধতার এক ঝোঁক পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এবং আধুনিক ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের সূচনাতে গিল্ড ব্যবস্থার কার্যকরী প্রভাব পড়ে। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী তাঁতীদের জীবন ও সংগ্রাম পর্যালোচনা করলে। তাঁদের মধ্যেও ছিল সঙ্ঘবদ্ধতার ঝোঁক—আধুনিক ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের যা হচ্ছে মূল সুর।

---

1. Ancient Foundation of Economic—K. T. Shah

এ যুগে শ্রমিকশ্রেণী যেমন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জনিত কারণে বেতন বৃদ্ধির দাবি তোলেন, তেমনি অষ্টাদশ শতকে বাংলা দেশের তাঁতীরা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মাশিয়াল রেসিডেন্টের কাছে বস্ত্রমূল্য বৃদ্ধির এক নোটিশ দিয়েছিলেন, কারণ হিসেবে তাঁরা চলতি বাজারের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ দর্শান।[২]

গিল্ড প্রথা গুজরাট ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে যেমন ব্যাপকভাবে ছিল, তেমনি ছিল বাংলাদেশে ঢাকা, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও রাজসাহী প্রভৃতি জেলাগুলিতে।

এসব গিল্ডের কারিগর শ্রেণী বিভিন্ন সময়ে যে আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন তা থেকেই একথা যথেষ্ট প্রমাণিত হয় যে, পূর্বে আমাদের দেশের কারিগরশ্রেণী ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংগ্রাম করতে জানত এবং সংগঠন গড়ে তোলবার প্রাথমিক এ চেতনা তাঁদের বিভিন্ন লড়াই ও অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত। সেই চেতনা পরবর্তীকালে পরিপুষ্ট হয়ে আধুনিক ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের জন্ম হয়।

গ্রেটবৃটেনেই প্রথম ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের জন্ম হয়। তার প্রধান কারণ সে-দেশেই প্রথম আধুনিক শিল্পের বিকাশ ঘটে। এ ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন পৃথিবীর প্রতিটি দেশের শ্রমিক শ্রেণীর ওপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু আমাদের দেশের ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন একমাত্র বিলেতের শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাবের ফলেই গড়ে উঠেছিল এরকম কোন স্বীকৃতি আমাদের দেশের কারিগর শ্রেণীর আন্দোলনের অতীত ইতিহাস দিতে ইচ্ছুক নয়।

ভারতে শিল্প বিকাশের প্রথম অবস্থায়ই ধনতন্ত্র শোষণের প্রচণ্ড চণ্ডনীতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। শ্রমিকদের দুঃসহ অবস্থার

2. Historical Record Commission. Proceeding Volume VIII. Part I—শ্রীহরিরঞ্জন ঘোষালের প্রবন্ধ।

মধ্যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি দীর্ঘ কাজের সময় অবিশ্বাস্য রকমের কম মাইনে—এ ছিল তখনকার দিনের কলকারখানার মালিকদের কায়েমী ব্যবস্থা। এসব অব্যবস্থার হাত থেকে নারী ও শিশু শ্রমিকেরা পর্যন্ত রেহাই পেত না। এমনকি পাঁচ-ছয় বছরের শিশু শ্রমিককে পর্যন্ত এ অবস্থার মধ্যেই কাজ করতে হত।

তখন কাজের দৈর্ঘ্যের জন্যে শ্রমিকদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল সব চেয়ে অসহনীয়। সাধারণভাবে সব কারখানাতেই কাজের সময় ছিল নির্দিষ্ট : "সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।" কোন ছুটির দিন অথবা সপ্তাহের কোন বিরতির দিন অথবা কখন কাজ আরম্ভ বা শেষ হবে —তার জন্যে কোন সময় বা নিয়ম নির্দিষ্ট ছিল না। সে-সব দিনের কারখানায় অরক্ষিত মেশিনগুলি অকৃপণভাবে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে শ্রমিক হত্যা করে যেত। এই ছিল সে-যুগের শ্রমিক শ্রেণীর জীবন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ কায়েমী জঙ্গলী আইন ব্যবস্থা চালু ছিল।

এ অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, ধর্মঘট, সভা-সমাবেশ ও দাবিপত্র পেশ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ভারতের শ্রমিক সাধারণ ক্রমে আন্দোলনের শক্তি অর্জন করতে থাকে ; এ সময়ে শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব কোন সংগঠন ছিল না। তা ছাড়া তাঁরা শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত আকারে তখনও আত্মপ্রকাশ করেনি।

বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রাথমিক যুগে আমরা দেখি : শ্রমিক শ্রেণী তাঁর উৎপাদনের যন্ত্রকে প্রধান শত্রু হিসেবে গ্রহণ করে তাকে অনেক সময় সে ধ্বংস পর্যন্ত করেছিল। কিন্তু ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের প্রাথমিক যুগে এরকম কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। এই লক্ষণীয় ব্যতিক্রমের মূলে রয়েছে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবীদের কাজ। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে একদল

সমাজসেবী তাদের মধ্যে নানা ধরনের সমাজকল্যাণ শিক্ষা ইত্যাদি প্রচারে ব্রতী হন। সে সব কাজের প্রভাবের ফলে, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংগঠিত আন্দোলনের সূচনা দেখা যায়। এ ছাড়াও শ্রমিক জীবনে সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছিল, ইতিপূর্বে ঘটে-যাওয়া, ভারতের জীবনে বড় বড় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সংগ্রামের ঘটনা।

খ। শ্রমিকদের মধ্যে সমাজসেবীদের কাজ

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের ধনতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থাকে প্রাথমিক যুগ হিসাবে বলা যেতে পারে। তখনও ধনতন্ত্র ভারতের সামাজিক জীবনে একটা শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়নি। আসাম, বাংলা, বোম্বাই, নাগপুর প্রভৃতি প্রদেশে সবেমাত্র শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। শ্রমিক শ্রেণী তখনও সংখ্যায় ছিল অতি সামান্য। এবং সংগঠন-সচেতনতা তখনও তাদের চেতনার মধ্যে পুরোপুরি অঙ্কুরিত হয়নি। আবার বিভিন্ন প্রদেশ শ্রমিকদের কোন সংযোগ-সেতুও ছিল না। যদিও তখন ভারতে রেলপথ গড়ে উঠেছে। এবং তার ফলে শ্রমিক চেতনায় গতি এসেছে এক আধুনিক জগতের আভাস তথাপি তখনো এ সেতুবন্ধন হয়নি।

রেলপথ শুধুমাত্র সাধারণ পরিবর্তনই সংগঠিত করল না সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের জীবনধারাকেও সে বদলে দিল। এবং সৃষ্টি করল শিল্প-নির্ভর মধ্যবর্গ শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণী। পূর্বে যা ছিল না, এমন এক অর্থনৈতিক ঐক্যে সমস্ত দেশকে আবদ্ধ করল এবং এ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এক রাজনৈতিক ঐক্যের সূচনা করল। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সত্যকারের সম্ভাবনাকেও বাস্তবায়িত করল এই প্রথম।[৩]

ভারতে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনে সূত্রপাত ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে।

৩। A People's History of England by—A. L. Morton

তার আগে সমাজসেবামূলক কাজের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে এবং বিচ্ছিন্নভাবে শ্রমিকদের মধ্যে কাজের কিছু কিছু প্রচেষ্টা হয়েছে। এই প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ব্রাহ্ম সমাজের কর্মতৎপরতা।

বাংলা দেশে শশীপদ ব্যানার্জীই প্রথম শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সমাজ-সেবামূলক কাজ সুরু করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তাঁরই উদ্যোগে শ্রমিকদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্ভবত এ সভাই হল ভারতের 'সংগঠিত' এক শ্রেণীর প্রথম জমায়েত। এ সভায় শশীপদ বাবু "এক সুদীর্ঘ ও সুললিত বক্তৃতায় তাহাদিগকে নিজেদের অবস্থার উন্নতিবিধানকল্পে সমবেত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ চেষ্টার প্রয়োজন"-এর[৪] কথা বলেন। এ সভা থেকে শ্রমিকদের শিক্ষার জন্যে বরানগরে একটি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে কামারপাড়া, আড়িয়াদহ, কুটিঘাটা প্রভৃতি স্থানে নৈশ বিদ্যালয় সম্প্রসারিত হয়।[৫]

ভারতবর্ষে সচেতন শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত হবার বহু পূর্বেই শশীপদই শ্রমিক কল্যাণের কথা ভেবেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকেরা যে কেবল শোষিত হচ্ছে তা শুধু নয় তাদের মধ্যে পান দোষ ইত্যাদি ব্যাধিও বিস্তারলাভ করে শ্রমিকদের দ্রুত অবনতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।[৬] তাই তিনি শ্রমিক কল্যাণের জন্যে বহুমুখী কাজ শুরু করেছিলেন, তার মধ্যে 'সুরাপান নিবারণী সমিতি' এবং 'আনা ব্যাঙ্ক' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪। নবযুগের সাধনা (১৯১৩)—কুলদাপ্রসাদ মল্লিক।

৫। ঐ।

৬। কর্মযোগী শশীপদ—প্রফুল্লরঞ্জন বসু রায়।

যখন ভারতে নানাস্থানে ডাকবিভাগীয় সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি তখন তিনি শ্রমজীবীদের মধ্যে 'আনা ব্যাঙ্ক' স্থাপন করেছিলেন।[৭]

গ। ভারতে প্রথম শ্রমিক সমিতি

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে শশীপদ ব্যানার্জী 'শ্রমজীবী সমিতি'[৮] প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা ভারতে এ প্রথম। সঙ্ঘের কার্যকলাপ সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, "শশীপদ বাবুর বাড়ীতে ও অন্যান্য সদস্যগণের বাড়ীতে এই সমিতির অধিবেশন হইত। এই সমিতির কার্য অনেকদিন যাবৎ বেশ নিয়মিতভাবে চলিয়াছিল। যেদিন এই সমিতির অধিবেশন হইত, সেইদিন শ্রমজীবীগণের আর আনন্দের সীমা থাকিত না, তাহাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি সকলেই এই নির্মল আনন্দে যোগদান করিত; শশীপদ বাবুর চেষ্টায় স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, স্বর্গীয় কালীশঙ্কর সুকুল প্রভৃতি খ্যাতনামা বক্তাগণ এই সমিতিতে যাইতেন ও নিয়মিতভাবে বক্তৃতা করিতেন। নৈতিক বিষয়ে ও চরিত্র গঠন সম্বন্ধে বক্তৃতা হইত।

শ্রমজীবীগণের দৈনন্দিন অভ্যাসে এই সমিতির কার্যও এই সমস্ত বক্তৃতা যে কি পরিমাণে সুফলপ্রদ হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সমিতির সদস্যগণ ক্রমে ক্রমে সচ্চরিত্র, কষ্টসহিষ্ণু, অনলস, মিতব্যয়ী ও মিতাচারী হইয়া উঠিতে লাগল। এই সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করিতে হইলে একেবারে সুরাপান পরিত্যাগ করিতে হইত।"[৯]

৭। ঐ।

৮। Working Men's Club

৯। নবযুগের সাধনা—কুলদাপ্রসাদ মল্লিক।

শ্রমজীবী সমিতি গঠন করে শশীপদ ব্যানার্জী শ্রমিকদের মধ্যে 'অর্থনৈতিক, চারিত্রিক, স্বাস্থ্যগত ও আধ্যাত্মিক' এবং শিক্ষামূলক কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু এই সমিতিতে সম্প্রদায়গত শ্রমজীবীদের স্থান কিরূপ ছিল, এ প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক। যেহেতু আধ্যাত্মিক কাজ এ সমিতির অঙ্গীভূত ছিল, সুতরাং শোষিত ও লাঞ্ছিত হিন্দু-মুসলিম শ্রমিকরা শ্রমজীবী সমিতেতে সাম্প্রদায়িক ঐক্যে সুদৃঢ় ছিল—এমন কথা হয়তো বলা যায় না। কারণ শশীপদকে পুনরায় মুসলিম শ্রমিকদের জন্যে আলাদাভাবে কাজ করতে হয়েছিল।

হিন্দু শ্রমজীবীদের মধ্যেই তাঁর কাজকর্ম শুধু সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুসলীম শ্রমিকদের সন্তানদের জন্যে একটি বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করলেন, সমস্ত সম্প্রদায় ও শ্রেণীর প্রতিই যে তাঁর কি রকম ব্যাপক সহানুভূতি ছিল, এ ঘটনায় তাঁর প্রমাণ হয়।[১০]

শশীপদ ব্যানার্জী সম্ভবত শ্রমজীবীদের মধ্যে এ সব কাজের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন বিলেতের সমাজসেবী মিস মেরী কারপেণ্টারের কাছ থেকে। ব্রিস্টলের মিস মেরী কারপেণ্টারের ভারত ভ্রমণের ফলে শশীপদ আরও উৎসাহিত হন শ্রমিক কল্যাণ এবং শ্রমিক আন্দোলনে। ইংলণ্ডে কি ভাবে শ্রমিক-আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে সে সম্পর্কে মিস মেরী কারপেণ্টার ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই জুন অনুষ্ঠিত সভায় বিশ্লেষণ করেন।[১১] মিস মেরী কারপেণ্টার বিলেতের ব্রিস্টল শহরে অনেক সমাজহিতৈষী মূলক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাত্রী। তাঁর সঙ্গে রামমোহন রায় এবং কেশবচন্দ্র সেন-এর খুবই ব্যক্তিগত, বন্ধুত্বপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রামমোহন রায়

১০। An Indian Pathfinder—Albion Rajkumer Banerji
শশীপদবাবুর পুত্র-(লেখক)।

১১। ঐ

বিলেতে থাকাকালে মিস মেরী কারপেণ্টারের ব্রিস্টলের গৃহ 'রেডলজ হাউস'-এ থাকতেন। মিস মেরী যখন তৃতীয়বার ভারতে আসেন, সে সময় শশীপদ ব্যানার্জীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। এবং বরানগরে শশীবাবুর বিভিন্ন সমাজহিতৈষীমূলক কাজের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শশীবাবুকে বিলেতে আমন্ত্রণ জানান।

মিস্ মেরী কারপেণ্টারের আমন্ত্রণের জবাবে শশীপদবাবু যে চিঠি লিখেছিলেন তাঁর মধ্যে শ্রমিকদের প্রতি তাঁর কাজের আগ্রহ যে কী অপরিসীম তার প্রমাণ মেলে। তিনি লেখেন: "আমরা ইংলণ্ডের শ্রমিকদের জীবনযাত্রা দেখে সেখানকার সংগঠন থেকে শিখিতে চাই। কারণ দেশে ফিরে এসে যাতে শ্রমিকশ্রেণীর কিছু কল্যাণ সাধন করতে পারি।"[১২]

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে এপ্রিল শশীপদ ব্যানার্জী সস্ত্রীক ওলগা জাহাজে চড়ে বিলেতের দিকে রওনা হন। শশীপদবাবুর স্ত্রী রাজকুমারী দেবীই এ দেশের প্রথম মহিলা যিনি বিলেতে যাবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

শশীপদ ব্যানার্জী বিলেতে বিভিন্ন সভায় ভারতের শ্রমজীবীদের দূরবস্থার কথা উল্লেখ করেন। একসভায় তিনি বলেন, ভারতের জনগণ অবহেলিত। সরকারও যেমন এদের জন্যে কিছু করেননি তেমনি করেনি "সহৃদয়" ব্যক্তিরা। আমরা এক শ্রমজীবী সমিতি স্থাপন করেছি এবং তার মধ্য দিয়ে আমাদের সামান্য সাধ্যানুসারে শ্রমকল্যাণ করে যাচ্ছি, যা আপনি আপনার দেশে ভালভাবেই করছেন। এবং এ কারণেই আপনার সহানুভূতি ও সাহায্যের আশায় আজ আমি এখানে এসেছি।"[১৩]

১২। An Indian Pathfinder—Albion Rajkumer Banerji

১৩। ঐ

বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দিয়ে, ভারতের জনসাধারণে প্রতি জনগণের শুধু সহানুভূতি তিনি সংগ্রহ করেননি। ভারতের জনগণের সামাজিক উন্নয়নের জন্যে যে কোন আন্দোলনে গ্রেট বৃটেনের জনগণ যাতে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেন তার জন্যে তিনি আবেদন জানান। তার ফলে লণ্ডন, বার্মিংহাম, ব্রিস্টল, গ্লাসগো, এডেনবার্গ, ম্যানচেষ্টার প্রভৃতি জায়গায় কতকগুলি কমিটি গঠিত হয় যাঁরা ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে সমর্থন জানানোই তাঁদের প্রিয় কাজ বলে ধরে নেন।

ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর জন্মকালের যুগটি ছিল একটি জংলী ব্যবস্থার সন্ধিক্ষণ। কোন আইন ছিল না। কাজের ঘণ্টার কোন সীমা ছিল না। মালিকদের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু সে সময় ইংলণ্ডের শ্রমিকদের জন্যে বহু আইন সৃষ্টি হয়েছিল। এসব শশীপদবাবু প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি বিলেতের বিভিন্ন সভায় এই বিষয়টির উল্লেখ করে বিলেতের শ্রমিকদের জন্যে প্রযুক্ত কারখানা আইন ভারতের শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও যাতে চালু হয় সে-দাবিও তিনি করেছিলেন।

এক বক্তৃতায় তিনি কারখানার জন্যে এক ধরনের হাফ-টাইম ফ্যাক্টরী অ্যাক্টের এক সুপারিশ করেন। তিনি সুপারিশে বলেন, কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিক (শিশু-শ্রমিকসহ)-দের জন্য দু' থেকে তিন ঘণ্টা অবকাশের প্রয়োজন এবং প্রতিটি কারখানায় এ ধারাটি আইনগত ভাবে বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত।[১৪]

ভারতীয়দের মধ্যে শশীপদই প্রথম শ্রমিক শ্রেণীর জন্য কারখানা আইন চালু করার জন্যে দাবি করেছিলেন। পরবর্তীকালে ব্রিটেনের সমাজহিতৈষীরা ভারতে কারখানা আইন চালু করার জন্যে বিভিন্ন

১৪। An Indian Pathfinder—Albion Rajkumer Banerji

হিতৈষীরা ত্বরান্বিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। "তিনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, শ্রমজীবী ও সাধারণ নিম্নশ্রেণীর লোকের জন্য, আরও বিস্তৃততরভাবে কার্য আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তিনি "ভারত শ্রমজীবী' নামক এক পয়সা মূল্যের এক সচিত্র মাসিকপত্র প্রচার করেন। এই মাসিক-পত্রের প্রচারও আশাতীত রকমের হইয়াছিল। পনর হাজারখানেক কাগজ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইত। এই মাসিকপত্র সুদূরবর্তী গ্রাম্য কৃষকদিগের নিকট পর্যন্ত যাইত।"[১৫]

বর্তমান যুগে উন্নততর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যা সম্ভব হয় নি, সেই প্রাথমিক যুগে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে কাগজের মাধ্যমে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর যে সেতু গড়ে উঠেছিল তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি শিক্ষণীয়। আজ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিরাট ব্যাপ্তি সত্ত্বেও আমরা কেন জানি তেমনিতর উদ্যোগ গ্রহণ করতে বা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারছি না, তা কী কেবল গোষ্ঠীগত দৃষ্টিভঙ্গী না সমস্যার শেকড় আরও গভীর কোন মূলে?—সেদিনের সেই ভ্যানগার্ড (অগ্রগামী) 'ভারত শ্রমজীবী' ইতিহাসের পাতায় এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম।

'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর শশীপদ ব্যানার্জীর স্বাক্ষর সহ একটি ইংরেজী ইস্তেহার প্রকাশিত হয়। এ ইস্তেহারে বলা হয়েছিল যে, পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য শিক্ষাবিস্তার এবং শ্রমজীবীদের কিভাবে উন্নতি করা যেতে পারে সে বিষয়ে উপদেশ ও উপায় এ পত্রিকায় নির্দেশ থাকবে। শ্রম-জীবীদের মধ্যে সম্পর্ক এবং মালিকের প্রতি এবং সমাজের প্রতি তাদের কী রকম মনোভাব হওয়া উচিত সে সম্পর্কেও নির্দেশ থাকবে। তবে

১৫। নবযুগের সাধনা

এ পত্রিকায় ধর্ম বা রাজনীতি বিষয়ে কোন আলোচনা থাকবে না বলে ইস্তাহারে ঘোষণা করা হয়েছিল।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে শশীপদ 'বরাহনগর সমাচার' নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ পত্রিকাতেও শ্রমজীবী জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের কথা প্রকাশিত হত।

শশীপদ স্কুল, সমিতি এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে শ্রমজীবী জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর একাজ থেকে সচেতন ও সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা হয় নি। এবং সে যুগে তা সম্ভবও ছিল না। তবে তিনি মালিক-শ্রমিক সম্পর্কে এক মধ্যস্থতার ভূমিকা গ্রহণ করতেন। "সে-সময়ে কলের শ্রমজীবীগণ ধর্মঘট করিত না। তাহাদের কলে কোন অসুবিধা হইলে তাহারা শশীপদ বাবুর নিকট আসিত—তিনি তাহাদিগকে শান্ত, সংযত কর্তব্যপরায়ণ হইতে উপদেশ দিতেন। তাহার পর কলের কর্তৃপক্ষের নিকট যাইয়া তাহাদের অভাব ও অভিযোগ সম্বন্ধে আলাপ করিতেন। কলের কর্তৃপক্ষগণেরও শশীপদবাবুর উপর বিশেষ আস্থা ছিল। ফলে তিনি মধ্যস্থতা করিয়া অনায়াসেই শ্রমজীবীগণের অভাব-অভিযোগের ন্যায় প্রতিকার করিতে পারিতেন।"[১৬]

শশীপদ ব্যানার্জী যে-সব কাজ সুরু করেছিলেন এবং তার প্রত্যেকটি কাজই ভারতের-শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে অগ্রগামী ভূমিকা হিসেবে স্বীকৃত হবে—যদিও একাজ নিছক সমাজসেবীমূলক। বরানগরে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি শ্রমজীবীদের মধ্যে কাজ করেছিলেন, কিন্তু সে কাজ কখনও ধনবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয় নি। প্রাথমিক যুগে তা' সম্ভবও ছিল না। কিন্তু

১৬। ঐ

শ্রমিকশ্রেণী শক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাজের কোন রূপান্তর ঘটে নি।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে শশীপদ মারা যান।

শশীপদ ব্যানার্জী ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতা ছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সুসংহতভাবে কাজ করে গিয়েছিলেন। নতুন যুগচেতনায় ব্রাহ্মসমাজের অবদান কম নয়। ব্রাহ্মসমাজ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যে সমাজসেবা মূলক কাজ সুরু করেছিল, তার মধ্যে যেমন একটা আধ্যাত্মিক দিক ছিল, তেমনি ছিল এক নতুনের ইঙ্গিত। এ আন্দোলনের নেতারা সংবাদপত্রে বিভিন্ন সভা সমিতিতে ভারতের শ্রমজীবীদের জীবন যাত্রার দিক তুলে ধরে তার সংস্কারের দাবি করেছিলেন। আমরা আগেই দেখেছি যে, শশীপদ প্রতিষ্ঠিত শ্রমজীবী সমিতিতে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় বক্তৃতা'দ দিতেন। দ্বারকা-নাথ ও কৃষ্ণকুমার মিত্র পরবর্তীকালে আসামের চা' শ্রমিকদের সম্পর্কে "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় লেখেন এবং এভাবে এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তারও আগে শিবনাথ শাস্ত্রী "সমদর্শী" পত্রিকায় এ বিষয়ে লিখেছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হ'ল ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন'এর কাজ। তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে আসামে চা শ্রমিকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। তিনি এবং দ্বারকানাথ "সঞ্জীবনী" এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সম্পাদিত "বেঙ্গলীর" পাতায় আসামের চা-শ্রমিকদের জন্য এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিপিনচন্দ্র পাল এবং দ্বারকানাথই প্রথম ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে শ্রমিকদের সম্পর্কে এক প্রস্তাব এনে জনসাধারণ এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এভাবে ব্রাহ্ম সমাজের নেতারা সমাজসেবা মূলক কাজের মধ্যে দিয়ে যার সূত্রপাত করেছিলেন, তাঁরাই পরবর্তীকালে অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের যুগে শ্রমিক ধর্মঘট আন্দোলন-এর

সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ রাখেন এবং এভাবে বাংলা দেশের শ্রমিক আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনাতে নিজেদের অগ্রভাগে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রেমতোষ বসু এবং উপাধ্যায় ব্রহ্ম মাধব-এর নাম স্মরণীয়। বাংলা দেশের ব্রাহ্মসমাজের সমাজহিতৈষীরা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে সমাজসেবার কাজ প্রথম আরম্ভ করেছিলেন তা সত্য, কিন্তু তা, তাঁরা শ্রমিক আন্দোলনের দিকে নিয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু বোম্বাইতে শ্রমিকদের মধ্যে সমাজ-হিতৈষীদের সে-কাজ শ্রমিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। বোম্বাইতে মহাদেও গোবিন্দ রাণাডি, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডার-কর এবং সরবজী বেঙ্গলী শ্রমিকদের মধ্যে সমাজ-সেবার কাজ সুরু করেন এবং মাদ্রাজ ও আমেদাবাদে একইভাবে কাজ সুরু হয়।

ঘ। শ্রমজীবীশ্রেণীর জাগরণ

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল, সমাজহিতৈষীমূলক কাজের গর্ভের মধ্যে। কিন্তু আন্দোলনের শক্তি যুগিয়েছিল, অতীতে ঘটে যাওয়া ভারতের শ্রমজীবী মানুষের বহু ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান। সে-সব অভ্যুত্থানের নায়কদের বংশধরেরা পরবর্তীকালে কলে-কারখানায় শ্রমিকশ্রেণী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ভারতে ধনতান্ত্রিক শিল্প ব্যবস্থার যুগ শুরু হয়েছিল, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। কিন্তু তাঁর আগেও ভারতে বিচ্ছিন্নভাবে কল-কারখানা গড়ে উঠেছিল। তবে, শিল্প যুগ হিসেবে ভারত'কে চিহ্নিত করা হয় —১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর। যান্ত্রিক শিল্প ব্যবস্থার আবির্ভাবের ফলেই জন্ম নিল—শ্রমিকশ্রেণী। তাই ভারতের শিল্প শ্রমিক'এর যুগ আরম্ভ হয়েছিল ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর। কিন্তু তার অনেক আগেই ভারতে বিরাট শ্রমজীবীশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে গিয়েছিল। এই শ্রমজীবী-শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকবাদের আঘাতে পর্যুদস্ত

ভারতের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল ভারতের সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে। জমি থেকে বিচ্যুত অথবা কুটীর শিল্প থেকে বিতাড়িত সংখ্যাহীন মানুষ সর্বহারা শ্রমজীবীশ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। আধুনিক ধনতন্ত্রের গৃহেই শুধু সর্বহারাশ্রেণী জন্ম নেয় না, সামন্ত যুগেও বহু মানুষের আবির্ভাব ঘটে যাঁদের, নিজেদের মেহনত মজুরির বিনিময়ে বিক্রী করতে হয়। তাঁদের হারাবার কিছু থাকে না। কিন্তু একথা ঠিক যে, এসব সর্বহারা মানুষ নির্দিষ্ট এক বৃন্তে মজুরি উপার্জকশ্রেণী হিসেবে টিকে থাকে না। তারা যেন মেহনত বিক্রীর এক চলমান স্রোত। কিন্তু কখনও তারা ইতিহাসের ভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি। ভারতের জনগণের ইতিহাসে বহু অভ্যুত্থানের উপাদান এ-শ্রমজীবীশ্রেণী রেখে গেছেন।

এ-রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সংগ্রামের ইতিহাস এখান থেকেই যেন কথা কয়ে উঠল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকাতায় অন্যান্য মজুরি উপার্জকশ্রেণীর মধ্যে পালকি বাহকেরা শ্রমজীবীশ্রেণী হিসেবে আবির্ভূত হ'ল। এরা মজুরির বিনিময়ে পালকি বইত। এবং পালকি বাহকেরা ছিল স্বাধীন মজুরি উপার্জকশ্রেণী। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর রোষানলে, পালকি বাহকদের পড়তে হল। অর্থাৎ পালকি বাহকদের মজুরি বেঁধে দেবার জন্য আইনী ব্যবস্থা তৈরি করা হল। প্রকৃত-পক্ষে মজুরি কমিয়ে দেবার একটি আইনত ব্যবস্থার সৃষ্টি হ'ল। পালকি বাহকদের ওপর সরকারের এ 'কৃপা' ব্যবস্থার কথা, অনেক আগেই তাঁরা জানতে পেরেছিলেন। সরকারী আইন চালু হওয়ার আগেই বিক্ষোভ সংগঠিত আকারে রূপ নিল। মে মাসে পালকি বাহকদের একটি সাধারণ সভা ডাকা হ'ল। এ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল—ময়দানে।

বর্তমান যুগে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর যে ধরনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়, এ সভাটি তেমনি ধরনের ছিল। শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রথম সংগ্রামী সভাটিতে সভাপতিত্ব করেন সর্দার পাঁচু সুর। আর প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তৃতা করেন গঙ্গাহরি। এ পাঁচু সুর ও গঙ্গাহরি কে? তৎকালীন পালকি বাহকদের অধিকাংশ ছিলেন ওড়িয়া। পাঁচু সুর কি বাইরের লোক ছিলেন? ইতিহাসে এটা এখনও অনুসন্ধানের বিষয়। কিন্তু গঙ্গাহরি যে একজন পালকি বাহক, তাঁর বক্তৃতায় তা বেশ বোঝা যায়। সাধারণ সভায় তিনি ঘোষণা করলেন, কর্তৃপক্ষ যে মজুরির হার বেঁধে দিয়েছেন, এর ফলে তাঁদের ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে। এর ফলে পালকি বাহকদের পরিশ্রমের পয়সার একাংশ সরকারের ঘরে তুলে দিতে হবে, একথনই হতে পারে না।

পালকি বাহকদের এ আন্দোলনের সমর্থনে সৌভ্রাত্রমূলক প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাড়োয়ান এবং ঘাট মাঝিদের প্রতিনিধিদ্বয়। ঘাট মাঝিদের প্রতিনিধি তিন কড়ির বক্তৃতাটি ছিল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের চেতনায় পরিপক্কতাপূর্ণ। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে, পালকি বাহকদের জন্য যে আইন করা হয়েছে, তাতে ঘাট মাঝিদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না সত্যি। সৌভ্রাতৃত্ব প্রকাশ করার জন্য তিনি এসেছেন। কিন্তু এ আইন মেনে নিলে তাঁদেরও একদিন ক্ষতির সম্ভাবনা আছে; কারণ তাঁদেরও মজুরি বেঁধে দেওয়া হতে পারে। এ আন্দোলন শুধু পালকি বাহকদের স্বার্থেই নয়, সমস্ত মজুরি উপার্জক-শ্রেণী এ আন্দোলনে উপকৃত হবেন।

এক শতাব্দীরও বহুকাল আগে, তিন কড়ি আগামী দিনের ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এক তাত্ত্বিক নির্দেশ ময়দানের সভায় দিয়ে গেলেন।

সমাবেশ করেই ময়দানের সভা শেষ হ'ল না। আইনের বিরুদ্ধে

আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে প্রস্তাব নেওয়া হল, একটি আবেদন-পত্র প্রস্তুত করে, তাতে গণস্বাক্ষর করে যথাস্থানে দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে আইন সরকারীভাবে ঘোষিত হল। সঙ্গে সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় ঘরোয়া সভা করে পালকি বাহকেরা বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হলেন। সরকারী সিদ্ধান্ত কাগজে ঘোষিত হওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যে লালবাজার পুলিস দপ্তরের সামনে কয়েক হাজার পালকি বাহক বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই এ বিক্ষোভ সংগঠিত আকারে রূপ নিল। পালকি বাহকেরা একটি সংগঠন গড়ে তুললেন। এবং ঐক্যবদ্ধভাবে শপথ গ্রহণ করলেন যে, লাইসেন্স গ্রহণের আইন বাতিল না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা পালকি বহন করবেন না। অর্থাৎ, তাঁরা ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এই সঙ্গে আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য একটি সংবিধানও তৈরি হয়ে গেল। অর্থাৎ, সংগঠনের সিদ্ধান্ত ভঙ্গকারীদের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে সমাজচ্যুত ও জাতিচ্যুত করার ব্যবস্থা করা হলো। সে যুগে এটাই ছিল সর্বোচ্চ সামাজিক আইনের দণ্ড বিধান।

পালকি বাহকেরা মিছিল করে পুলিস অফিসে যায় এবং নিয়ন্ত্রণ আইন ও লাইসেন্স ব্যবস্থার অবসান দাবি করে। তাঁরা সংখ্যায় কয়েক হাজার ছিল। তাঁদের সেখান থেকে বের করে দেওয়া হলে, সুপ্রিম কোর্টের সম্মুখে এসে জমা হয় এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও উচ্চ কণ্ঠে 'শ্লোগান' দিতে থাকে। এভাবে মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করার সাথে সাথে তাঁরা উক্ত আইনের বিরুদ্ধে দরখাস্ত পেশ করল। এ দরখাস্তটি মুসাবিদা করে দিয়েছিলেন একজন বাঙালী কেরানী এবং তার জন্যে পালকি বাহকদের দশ টাকা পারিশ্রমিক দিতে হয়েছিল। তখনও শ্রমজীবীদের সংগঠনে কাজ করার মত অবৈতনিক 'বহিরাগত'

শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী এগিয়ে আসে নি। এভাবে মূল্য দিয়ে এবং উকিলদের সাহায্য নিয়ে শ্রমজীবীশ্রেণী আন্দোলন পরিচালনা করতেন। এ ব্যবস্থা বহুকাল চলেছিল। ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পরিপূর্ণ বিকাশ কালেও শ্রমিক আন্দোলনে উকিল-শ্রেণীর ভূমিকা বজায় ছিল। 'নিয়ন্ত্রণ পথে' দাবি আদায় করা এবং সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন সৃষ্টির মূলে তৎকালীন উকিল সমাজ এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

পালকি বাহকদের পক্ষ থেকে গোপাল এবং রাম-এর নামে দরখাস্তটি যথাস্থানে পাঠান হল, কিন্তু কোন ফল হল না। ধর্মঘট চলতে থাকল। তৎকালীন সাহেবদের সংবাদপত্রে পালকি বাহকদের বিরুদ্ধে লেখালেখি শুরু হয়ে গেল। এমন কি একটি সংবাদপত্র নির্দেশ দিয়ে বসল, টাট্টু ঘোড়া দিয়ে পালকি গাড়ি চালাবার চেষ্টা করা হোক। যদিও কয়েকটি উদারপন্থী দেশীয় সংবাদপত্র সরকারী আইনের বিরুদ্ধে 'মৃদু' সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন। যা পালকি বাহকদের ধর্মঘট আন্দোলনে নৈতিক সমর্থন যুগিয়েছিল।

এক মাসেরও বেশি সময় এ ধর্মঘট আন্দোলন চলেছে। সভা-সমাবেশ, মিছিল এবং গণদরখাস্ত সহ শ্রমিক আন্দোলনের সব কয়টি পথই তৎকালীন পালকি বাহকেরা গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি ধর্মঘটীরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মীমাংসার আলাপ আলোচনাও চালিয়েছিলেন।[১৭]

পালকি ধর্মঘট ব্যর্থ হলেও, ইতিহাসে এক স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেল। অ-সংগঠিত শ্রমজীবীশ্রেণী যে-ভাবে এ আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন, ইতিহাসে তা ছিল এক নতুন শিক্ষা। আগামী দিনের জন্য তাঁরা এ-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রেখে গিয়েছিলেন প্রেরণা এবং শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নীতি ও কৌশল।

১৭। **John Bull 1927—May-June.**

৬। ভারতে শিল্প শ্রমিকদের প্রথম ধর্মঘট

ভারতে কারখানা শিল্প গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমিকশ্রেণী কাজের ঘণ্টার অমানুষিক চাপে পিষ্ট হতে থাকে। কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবির মধ্যে ভারতে শ্রমিক আন্দোলন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। শ্রমিক আন্দোলনেরও এ-ভাবেই সূচনা হয়। ১৮২০ থেকে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাজের ঘণ্টা কমাবার দাবিতে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধর্মঘটের পর ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। এ ধর্মঘটে দৈনিক দশ ঘণ্টা কাজের নিয়ম চালু করার জন্যে সুনির্দিষ্ট দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু সে সময়ে কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবি সংগঠিত আন্দোলন হিসেবে বিশ্বে দেখা দেয় নি। বিচ্ছিন্নতর এ আন্দোলন পরে মিলিত আন্দোলনের রূপে রূপান্তরিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট। আমেরিকার ষাটটি ট্রেড ইউনিয়ন'এর প্রতিনিধিবৃন্দ মিলিত হলেন বলটিমোরে। একেই বিশ্বে একটি জাতীয় সম্মিলিত সংগঠন গড়ে তুলবার প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে। আমেরিকার শ্রমিক-শ্রেণীকে পুঁজিবাদীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করবার জন্যে প্রথম কাজ হিসেবে এ সম্মেলন কাজের ঘণ্টা কমানোর কর্মসূচীর আন্দোলন গ্রহণ করলেন এবং ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করলেন। দাবি: আট ঘণ্টা কাজ। এ ভাবেই শ্রমিকদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর সূচনা হয়। ন্যাশনাল লেবার ইউ-নিয়নের আন্দোলনের দৃষ্টান্তে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আট ঘণ্টা কাজের দাবির ভিত্তিতে শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন ও আন্দোলনের দ্বিতীয় শুভ সূচনা হ'ল।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম আর্ন্তজাতিকে জেনেভা কংগ্রেস ঐ দাবির সমর্থন করে এবং এক বিবৃতি দেয়। তবে আট ঘণ্টা কাজের দাবির আন্দোলন বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখটি বেছে নেওয়া হয়েছিল আট ঘণ্টা কাজের দাবির দিন হিসাবে। এ ভাবেই কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবির আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন হল। তাই ১লা মে তারিখটি বিশ্বের শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের কাছে আজ এক পবিত্র দিন। পুঁজিবাদী শোষকের নির্মম হাত থেকে কিছুটা সুবিধা আদায় করার জন্যে শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বব্যাপী এ আন্দোলনের কোন লক্ষণ কি ভারতে দেখা গিয়েছিল?

ভারতের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব হয় ইউরোপের চেয়ে অনেক পরে। স্বভাবতঃই ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম-লগ্নের সূচনাও তুলনামূলকভাবে বহু কাল পরে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে। এবং এটি ঘটালেন ভারতের শ্রমিকশ্রেণী। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে প্রথম রেলপথ খোলা হয়। বিশ মাইলের এ রেলপথ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গিয়ে দাঁড়াল তিন-শ মাইলে। তার সীমাবদ্ধ অগ্রগতি নিয়ে এবং বিচ্ছিন্নভাবে ছিল সর্ব-ভারতে এ-রেলপথ। তখনও সুসংহতভাবে প্রদেশে প্রদেশে রেলপথের সংযোগ হয় নি।

শ্রমিক সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য। চেতনা ও সংগঠনের দিক থেকে শ্রমিকশ্রেণী তখনও আত্মপ্রকাশ করে নি। অধিকাংশ শ্রমিক ছিল ঠিকাদার প্রথায় নিযুক্ত। বেতন ও হাজিরার দিক থেকে তখনও তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল না। রেলপথের সবচেয়ে সচেতন কাজে নিযুক্ত ছিল অ-ভারতীয় শ্রমিক। অর্থাৎ, ইংরেজ-জাত। রেলগাড়ী ইঞ্জিন ড্রাইভার, গার্ড, মেকানিকরা সবাই ছিলেন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ইংরেজ। এঁদের সঙ্গে ভারতীয় শ্রমিকদের খুব হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল না। রেল কোম্পানী উভয় অংশের শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদমূলক ব্যবস্থা করে রাখল। যার ফলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কোন সুযোগ ছিল

না। এ রকম অবস্থার মধ্যে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী এক তাৎপর্যপূর্ণ অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বসল।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে হাওড়ার রেলওয়ে স্টেশনে প্রায় বার'শ শ্রমিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে এক ধর্মঘট করল। এ ধর্মঘটের সমর্থনে এগিয়ে এল বাংলা দেশের সংবাদপত্র। শ্রমিকদের দাবি মেনে নেবার জন্যে তারা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানালেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ হুঁশিয়ারিও করে দিলেন যে তাঁরা শ্রমিকদের দাবি মেনে না নিলে, নতুন লোক নিয়োগ করার কোন সুযোগও কর্তৃপক্ষ পাবে না।১৮

ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এ নব-জীবনে, এ অভ্যুদয়ের মধ্যে কোন আদিম বা অবৈজ্ঞানিক ঘটনা ছিল না। ভারতের সামাজিক জীবনের এক সুস্থ ও সহজাত প্রকৃতির মধ্য দিয়ে, শ্রমিকশ্রেণীর এ ধর্মঘট এক রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন ঘটনারূপে বিধৃত। বিশ্বে যে ঘটনা তখনও আত্মপ্রকাশ করে নি, তার অনেক আগেই এমন একটি ঘটনার সৃষ্টি করে শ্রমিকশ্রেণী সর্বহারাশ্রেণীর এক রাজনৈতিক উন্মেষ ঘটাল। এমন কি একে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে-র সংগ্রামের পূর্বসূরী বলা যায়। প্রথম আন্তর্জাতিকের কয়েক বছর আগেই এ অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটল।

৮। শ্রমিকশ্রেণীর উন্মেষ

বিদেশের অনুকরণের মধ্যে দিয়ে ভারতের ধর্মঘট আন্দোলন জন্ম নেয় নি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবী মানুষ নিজ নিজ দেশের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী, বিভিন্ন সময়ে ধর্মঘট করেছেন এবং ধর্মঘটকে আন্দোলনের পথ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এবং এ-ভাবেই বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণী স্ব স্ব দেশের ধর্মঘট আন্দোলনের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে একাত্ম হতে শুরু করেন এবং পরে তা' শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের রূপ পরিগ্রহ করে।

১৮। সোম প্রকাশ—১৮৬২

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, শিল্প বিপ্লব হওয়ার বহু পূর্বেই আমাদের দেশে ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মঘট আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় সহস্র বছরের পুরান স্মৃতি, অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবের বহু পূর্বেই ধর্মঘট শ্রমজীবী মানুষের কাছে সুপরিচিত।

ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, মোগল যুগে আকবরের সরকারী কারখানার কারিগরশ্রেণী ধর্মঘট করেছিলেন এবং তেমনি ঔরঙ্গজেবের আমলে সরকারী কর নীতির প্রতিবাদে দিল্লীর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হরতাল পালন করে শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তার পরবর্তীকালে বহু ঘটনা ঘটেছিল, যা' ভারতের জনগণের গৌরবজনক ভূমিকা ইতিহাস অস্বীকার করতে পারে নি। এবং সে-সব ঘটনা ও অভ্যুত্থান ইতিহাসের বিভিন্ন সামাজিক বিবর্তনের স্রোত ধারার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এক নতুন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, সে গতি সচেতনতায় পরিপূর্ণ হয়ে এক নতুন যুগে প্রবেশ করল।

সে যুগের শুরু ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে।

ভারতের যান্ত্রিক শিল্পের অঙ্কুর প্রোথিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীও ধর্মঘট আন্দোলনের জন্ম দেয়। এবং প্রথম ধর্মঘট ও তার পরবর্তী কাল অর্থাৎ, পঁচিশ বছরের মধ্যে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের আত্ম-প্রকাশ ঘটে। এ ঘটনা পৃথিবীর শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসের বিচারে, ভারতের শ্রমিক আন্দোলন যান্ত্রিক শিল্প বিকাশের খুবই অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে, যা' ইংল্যাণ্ডেও দেখা যায় নি। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক আন্দোলন জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে ভাবে নবচেতনার তত্ত্ব এবং তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য সংগঠিত সচেতন শক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল, ভারতে তা ঘটে নি। ফলে, ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক আন্দোলন আন্তর্জাতিক রূপ গ্রহণ করলেও ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর নব্য অভ্যুত্থান শক্তি প্রদেশের গণ্ডী ডিঙ্গিয়ে

ভারতের সর্বত্র কেন্দ্রীভূত রূপ নিতে পারে নি ; ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে সেটিই হল ট্র্যাজেডি।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ধর্মঘটের সমকালীন আর একটি বিক্ষোভের কথা জানা যায়। একই বছরে ঘটনাটি ঘটে।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ইস্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে অডিট ডিপার্টমেণ্টের বড় সাহেব বাঙালী কেরানীদের অপমান করায়, কর্মচারীরা পরের দিন কাজে যোগদানে বিরত থাকেন, অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং সে বিক্ষোভের সামনে সাহেব নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। অর্থাৎ, কর্মচারীদের কাছে সাহেব ক্ষমা চাওয়ার পরই বিরোধটির নিষ্পত্তি হয়। এ-ঘটনা দুটি যেমন শিল্প শ্রমিক ও কর্মচারীদের বিক্ষোভ আন্দোলনের সাক্ষ্য বহন করে, তেমনি অপরদিকে, অন্যস্তরের শ্রমজীবী মানুষেরও ধর্মঘট আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে, তার অনেক সাক্ষ্য ইতিহাসের পাতায় রয়েছে।১৯

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বের তিন হাজার নরসুন্দরের ধর্মঘট, কলকাতার পালকি বাহকদের ধর্মঘট, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের কলকাতার ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান ও মাদ্রাজের মাংস বিক্রেতাদের ধর্মঘট, এ-সব ঘটনা ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের উজ্জ্বল স্মৃতি-ফলক, যা শ্রমজীবী মানুষকে জাগৃতির নির্দেশ দেয়।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বের সরকারী প্রেস কম্পোজিটাদের ধর্মঘটও কম উল্লেখযোগ্য নয়। এ ধর্মঘটকে ভাঙ্গার জন্য সরকার প্রথম যে কৌশল নেয়, তা ভারতে অপরিচিত ছিল। সরকার মাদ্রাজ থেকে পঞ্চাশ জন দালাল সংগ্রহ করে আনে। ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য যে ধরনের দমননীতি চালান হয়, এই বিংশ শতাব্দীতেও আমরা তার কিছু সাম্প্রতিক নমুনা পাই।

১৯। সোমপ্রকাশ

শ্রমিক আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকার নির্যাতনের সমস্ত রকমের কলা কৌশল ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম জাগৃতির উন্মাদনাকে রোধ করতে পারে নি। এখানে মনে রাখা দরকার, শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম বিদ্রোহের কিছুকাল পূর্বে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে সরকারের ফাঁসি, লাঠি, গুলি অত্যাচারের বীভৎস দৃশ্য শ্রমিকেরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, বিভিন্ন প্রদেশের কৃষক আন্দোলন দমনের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে নারকীয় কাণ্ড করে তা-ও তাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল, তবু জীবন ও জীবিকার দাবিতে ভারতে প্রথম শ্রমিকশ্রেণী রুখে দাঁড়াতে একটুও ভয় পায় নি। আজকের রাজনৈতিক সচেতন অগ্রগামী শ্রমিকশ্রেণীর তারাই ছিলেন পূর্বসূরী।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতে শ্রমিক সংগঠনের সুচনা

ক। ভারতে প্রথম শ্রমিক সংগঠন

ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টদশকের শেষে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামী শক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে। বিশেষ করে, বোম্বের বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীচেতনার লক্ষণ ফুটে ওঠে। এবং এখান থেকেই ভারতের সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল বোম্বের বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকদের একটি সমাবেশ হয়, আর এটাই ছিল সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা। যদিও ১৮৬২-৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে কয়েকটি ধর্মঘট হয়েছে, তবু একে সংগ্রামী আন্দোলনের সংঘবদ্ধ রূপ বলা যায় না। সে-সব ধর্মঘট, ঘটনার দিক থেকে ছিল ঐতিহাসিক, কিন্তু সংগঠনের দিক থেকে ছিল দুর্বল। বিস্ময়ের কথা হ'ল, ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির পীঠস্থান বাঙলা দেশে কোন শ্রমিক সংগঠনের সূচনা হলো না, বরং ব্রাহ্ম সমাজের নেতা শশীপদ ব্যানার্জীর সেবামূলক কাজের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলন প্রধানত সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। অথচ, সে সময়ে বাঙলা দেশে এক বিরাট নবজাগরণের আন্দোলন হয় যা-সমাজ জীবনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যায়।

বোম্বে নগরী গড়ে উঠেছিল ভারতীয় পুঁজিকে কেন্দ্র করে; বিরাট বিরাট বস্ত্র শিল্প গড়ার মধ্যে দিয়ে। এ শিল্পকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বৈষম্যমূলক প্রতিরোধ শক্তির মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। এবং রাজনৈতিক ও আর্থিক সমাজ চেতনার দিক থেকে বোম্বে ছিল শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে প্রতিকূল শহর। মাত্র কয়েক বছর আগে এখানে গড়ে উঠেছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। এবং জাতীয় কংগ্রেসকে ঘিরে যে শক্তির উত্থান ঘটেছিল, প্রধানত তাঁরা ছিলেন, ভারতীয় পুঁজির অগ্রিকারক। স্বভাবতঃই শ্রমিকশ্রেণী সে শক্তির কাছ থেকে কোন সমর্থন সূচক অভিনন্দন পাবার আশা রাখে না। যে সময়ে জাতীয় কংগ্রেস বোম্বেতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন বোম্বের শ্রমিকশ্রেণী এক শোচনীয় জংলী জীবন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে কাল কাটাচ্ছিল। কংগ্রেস নেতাদের নজর এদিকে পড়েনি।

ভারতের রাজনীতিক জীবনের উত্থান যুগে, বোম্বের শ্রমিকশ্রেণীকে নিজ শক্তির উপর আস্থা রেখেই পথ করে এগিয়ে যেতে হয়েছিল।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল বস্ত্র শিল্পের দশ হাজার শ্রমিকের যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, শ্রমিক সচেতনতার দিক থেকে তা ছিল অবিস্মরণীয়। এই সভাতে দুজন মহিলা শ্রমিক বক্তৃতা করেন এবং একটি দাবি পত্র গৃহীত হয়: এই দাবি-পত্রে সতর শত শ্রমিক স্বাক্ষর করেন, যা স্মারক-লিপি আকারে কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হয়। এই স্মারক-লিপিতে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কারখানা আইনের সংশোধন দাবির সঙ্গে সঙ্গে ছিল সপ্তাহে একদিনের ছুটি। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে সপ্তাহে একদিন ছুটির দাবি—এই প্রথম উচ্চারিত হ'ল।

বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকেরা সভা ও স্মারক লিপির মধ্যে নিজেদের শুধু আবদ্ধ করে রাখলেন না, দাবি আদায় করার জন্যে নিজেদের একটি

সংগঠন গড়ে তুললেন। এই সংগঠন গড়ার পুরোভাগে ছিলেন, বস্ত্র শিল্পের কর্মচারী এন, এম, লোকাণ্ডে। এইভাবে ভারতের প্রথম শ্রমিক সংগঠন 'বোম্বে মিল হ্যাণ্ডস্ এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন, এন, এম, লোকাণ্ডে ও ডি, সি, আঠেরী। 'বোম্বে মিল হ্যাণ্ডস এসোসিয়েশন'এর পক্ষ থেকে মারাঠী ভাষায় 'দীনবন্ধু' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত করা হয়।

খ। শ্রমিক সংগঠন ও ধর্মঘট আন্দোলন

ভারতের শ্রমিকশ্রেণী নতুন প্রেরণার উৎস নিয়ে শ্রমিক সংগঠন গড়ার কাজে নামেন এবং ধর্মঘট আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকেন। কিন্তু ধর্মঘটের পরিধির তুলনায় শ্রমিক সংগঠন ছিল সীমিত শক্তি। এর প্রধান কারণ হল, একদিকে যেমন তখন নেতৃত্ব গড়ে ওঠে নি বা নেতৃত্ব দেবার মত মানুষের ছিল সংখ্যাল্পতা অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণী বলতে যে ব্যাপকতাকে বোঝায়, তার প্রকাশ তখন ঘটে নি। তা' সত্ত্বেও যে সব ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় তা স্বতস্ফূর্ততার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হলেও, তার মধ্যেই ভবিষ্যতের অগ্রগামী সংগঠনের ভ্রূণ বাড়ছিল।

১৮৬২-১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ধর্মঘটগুলি ছিল, কারখানা আইনের প্রবর্তন, সপ্তাহে একদিন ছুটি ও মজুরি বৃদ্ধি, প্রভৃতি শ্রমিক আন্দোলনের মৌলিক অধিকারগুলো সামনে রেখে।

এইসব দাবিতে তখন ধর্মঘট করা শ্রমিকদের পক্ষে খুব সহজ ছিল না। একদিকে শ্রমিকরা ছিল অসংগঠিত অন্যদিকে ছিল মালিক দের অসম্ভব রকমের জুলুম এবং সরকারের পৃষ্ঠাপোষকতায় শ্রমিক পীড়নের ছিল প্রচণ্ড তাণ্ডব। তবু এরই মধ্যে শ্রমিকদের অগ্রগামী অংশ ধর্মঘট সংগঠিত করার দুঃসাহস সেদিন করেছিলেন। বোম্বে মিল মালিক সমিতির কারখানা শ্রমিকদের জন্যে যে নিয়মাবলী করেছিলেন, তাতে বলা হয়েছে যে: যে-সব ব্যক্তি ধর্মঘট করবে বা অন্যকে

ধর্মঘটের জন্য উস্কাবে তাদের তৎক্ষণাৎ চাকুরিচ্যুত করা এবং তাদের বকেয়া বেতন বাজেয়াপ্ত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

মালিকশ্রেণীর এই জংলী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর আইনতঃ কোন রক্ষাকবচ ছিল না। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের সাহায্যে মালিকেরা কোর্টের সাহায্য নিয়ে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। তা সত্বেও বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকেরা আন্দোলনের মারফত ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর জন্যে (১৮৮১ ও ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে) দু-দুটি কারখানা আইন আদায় করে নিয়েছিলেন। যার ফলে শ্রমিক-শ্রেণী সর্বপ্রথম কিছুটা অধিকার অর্জন করতে পারলেন।

১৮৬২-১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র ও বিভিন্ন শিল্পে অসংখ্য ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়।

এইসব ধর্মঘট আন্দোলনের পরও কোন শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে ওঠে নি। যে সব সংগঠনগুলোর অস্তিত্ব ছিল, তারও মধ্যে সজীবতা ছিল না। 'বোম্বে মিলস্ হ্যাণ্ডস্ এসোসিয়েশন' প্রথম ফ্যাক্টরী আইন ও ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত কারখানা আইনের পর তার কোন সক্রিয়তা দেখা যায় নি। অবশ্যই তার একটি কারণ ছিল, বোম্বে সরকার এন, লোকাণ্ডেকে ফ্যাক্টরী কমিশনার নিযুক্ত করেন। ফলে তাঁর পক্ষে আর সক্রিয় শ্রমিক আন্দোলন করা সম্ভব ছিল না। এবং এন, এম লোকাণ্ডের মৃত্যুর পর (১৯০০-'০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়) বোম্বে মিলস্ হ্যাণ্ড এসোসিয়েশন 'এর আর কোন বিশেষ তৎপরতা দেখা যায় নি।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথম সুতাকলশ্রমিকদের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জি, আই, পি, রেলওয়ে সিগনেলার্সদের সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার এক বছর পর ভারত ও ব্রহ্মদেশে রেল

কর্মচারীদের 'এমালগেমেটেড সোসাইটি অব রেলওয়ে সার্ভেন্টস অব ইণ্ডিয়া এণ্ড বার্মা'র জন্ম হয়। এ ঘটনা থেকে রেল শ্রমিক কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সংগঠন (সর্বভারতীয়) গড়ার লক্ষণ ফুটে ওঠে।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা দেশে আর দুটি সংগঠনের কথা জানা যায়। মহামেডান এসোসিয়েশনটি চটকল শ্রমিকদের একটি ধর্মীয় সংগঠন বলা চলে, কিন্তু 'দি ইণ্ডিয়ান লেবার ইউনিয়ন'টি ছিল সরাসরি শ্রমিকদের নিজস্ব সংগঠন। দি ইণ্ডিয়ান লেবার ইউনিয়নের পেছনে ছিলেন জনৈক ব্যারিস্টার। যদিও ঐ সংগঠন-এর কর্মক্ষেত্রের ইতিহাস বিশেষভাবে জানা যায় নি, কিন্তু এর পেছনে যে একজন ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তি ছিলেন তার পরিচয় মেলে বিশেষ করে ইউনিয়নের নামটির মধ্যে। লেবার ইউনিয়নের সদস্য যে কোন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকই হতে পারতেন।

সাধারণত স্ব স্ব শিল্প ভিত্তিক ইউনিয়ন হয়ে থাকে। অন্য শিল্পের শ্রমিকরা এর মধ্যে থাকে না। তবে কি ধরে নিতে হবে যে, সেই লেবার ইউনিয়ন ব্যাপক অর্থে বর্তমান কালের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের একটি ক্ষুদ্র আদল ছিল? বিশেষ করে, আঞ্চলিক ভিত্তির গণ্ডির দেয়ালকে ঐ নামটি ডিঙ্গিয়ে অনেক ব্যাপক করে দিয়েছে। তাতেই এ প্রশ্ন স্বাভাবিক।

এইভাবেই দিকে দিকে ট্রেড ইউনিয়ন 'চেতনা' লক্ষ্য করা যায়।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী ছাপাখানার শ্রমিকরা 'প্রিন্টার্স ইউনিয়ন' নামে সংগঠন গড়ে তোলেন। ভারতের সরকারী শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলনের এক লাল তারিখ এই—১৯০৫। সরকারী শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলনের জনক এই বাংলার ছাপাখানার শ্রমিক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রমিক-শ্রেণীর রাজনৈতিক জাগরণ

ক। পটভূমিকা

১৯০৫-৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এক নতুন রূপ দেখা যায়। বলা যেতে পারে, এই সময়ে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী আন্দোলন এক গণভিত্তিক পরিধিতে বিস্তৃত হয়। এবং শ্রমিকশ্রেণীও ধীরে ধীরে জাতীয় আন্দোলনের দিকে ঝোঁকে।

ভারতের শ্রমিকশ্রেণী শুধু যে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক আন্দোলনের সংগ্রামে সীমাবদ্ধ হয়ে রইলেন—তা' নয়। শ্রমিকশ্রেণী অর্থনৈতিক আন্দোলনের স্তর থেকে ক্রমশঃ রাজনৈতিক আন্দোলনের স্তরে উন্নীত হতে থাকে।

১৯০৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর চতুর্দিকে যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে তার মধ্যে ১৯০৫ সালের রুশবিপ্লব দিক-নির্দেশক ঘটনা। রুশ বিপ্লব ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ফলে কংগ্রেস নেতৃত্বের আপসমূলক চরিত্রের কিছু চরিত্রবদল হয়। সংগ্রামী চেতনার মেজাজও দেখা দেয় আন্দোলনে। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে নরম ও চরমপন্থীর দুই দল দেখা দেয়। কংগ্রেসের তৎকালীন "চরমপন্থী"দের প্রচণ্ড অবদান আছে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে; এই সময় যে সব বড় বড় শ্রমিক ধর্মঘট হয়, তার পেছনে চরমপন্থীদের

উৎসাহ ছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতারা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে 'কন্সেশন আদায়', 'সমাজ উন্নতি' ইত্যাকার ধাঁধার মধ্যেই ছিলেন। সেই সময় কংগ্রেসের দাবিগুলো বিভিন্ন প্রস্তাবাবলীতে বা নেতৃবৃন্দের জনসভায় বক্তৃতা অথবা তত্ত্বমূলক বিবৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মূল দাবি ছিল—ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়গণের অংশ গ্রহণের ও ভারতীয় বুর্জোয়াদের বিকাশের জন্যে শিল্প পত্তনের সুযোগ সুবিধা। কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে, এ সব প্রবক্তারা সবাই জাতীয়তা-বাদের বিরোধী ও বিদেশী শোষকবাদের একবারে জো-হুকুমের অনুগত ভৃত্য ছিলেন। বরং স্পষ্ট করে বলা যায়, তাঁরাই ছিলেন ভারতের প্রগতি-শীল শক্তির উত্তরসূরী। মনে রাখা দরকার, এ সময়ে ভারতের শ্রমিক-কৃষক—মধ্যবিত্ত তখনও শ্রেণী সচেতন হয়ে ওঠে নি এবং ভারতের বুর্জোয়াতন্ত্রের শক্তি, সমাজ জীবনে একশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠাও লাভ করে নি। বরং স্বদেশের পুঁজিতন্ত্রীরা দেশে শিল্প গঠনের জন্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শিল্প বিকাশের পরিপন্থীনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিলেন এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত থেকেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন এবং স্বদেশের পুঁজিতন্ত্রী-শ্রেণীর নিজ নিজ চিন্তার অনুভূতি তীব্র আকারে সংগ্রামের ময়দানে দ্বন্দ্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, ১৯০৫-৮ খ্রীষ্টাব্দে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। এই সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বাঙলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করার কথা ঘোষণা করেন। মজুত বারুদে কে যেন দেশলাই জ্বেলে দিল। সমগ্র ভারতে বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিপ্লবী শিখা দাউ দাউ করে উঠল।

ইতিহাসে এই আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলন নামে পরিচিত।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে এবং এখানে স্বদেশী আন্দোলনের প্রশ্ন নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়। কিন্তু আপসমূলক প্রস্তাব হিসেবে এই কংগ্রেস থেকে স্বদেশী আন্দোলন অর্থাৎ বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলকাতার অধিবেশনে সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব চরম আকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং চরম ও নরমপন্থী দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। চরমপন্থীরা বললেন, শুধু বর্জন আন্দোলনে কোন কাজ হবে না, তাই তাঁরা ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করার জন্যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করবেন। এবং এই কংগ্রেস থেকেই চরমপন্থীদের চাপে স্বরাজের দাবি তোলা হল। আর এভাবেই সারা ভারতে হাজার হাজার স্বদেশবাসী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সামিল হলেন এবং ব্রিটিশ বুলেটের সন্ত্রাসে সে আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে পারল না। বিপ্লবের জয়ভেরী যেন দিকে দিকে বেজে উঠল এবং আন্দোলন বঙ্গ ভঙ্গের রদ পর্যন্ত সশস্ত্র এবং গণভিত্তি পর্যায়ে রইল।

ভারতব্যাপী এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ এবং বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল ও লালা লাজপত রায়—ইতিহাসে যাঁরা লাল-বাল-পাল ত্রয়ী নামে খ্যাত।

১৯০৫-৮ খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থান জাতীয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক ভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ভারতের এই সংগঠিত জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, গণসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের পথে নিবদ্ধ হয়ে গেল।

থ। শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ

এই পটভূমিকায় ভারতের শ্রমিক আন্দোলন এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি ভারতের শ্রমিক ধর্মঘটগুলো অনুষ্ঠিত হ'তে থাকে। কোন কোন ধর্মঘট প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবযুক্ত ছিল এবং এইসব ধর্মঘট আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন—বাল গঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল, প্রমুখ। বোম্বে ও বাঙলা দেশে চরমপন্থীরা সক্রিয়ভাবে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে শুধু যুক্তই ছিলেন না, তাঁরা শ্রমিক সংগঠনও গড়ে তুলেছিলেন এবং এইসব সংগঠনগুলোর মধ্যে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর জন্য সংগ্রামও করেছেন। বোম্বেতে চরপন্থীরা শ্রমিকশ্রেণীর জীবন যাত্রার মান উন্নততর করার ও কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবিতে সভা সমাবেশ সংগঠিত করেন। ভারতের জনগণের প্রথম সংগ্রামী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক, চরমপন্থী গ্রুপ প্রতিষ্ঠা হওয়ার অনেক আগে থেকেই বোম্বের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে জি, আই, পি, রেলওয়ের (মহারাষ্ট্র) সিগ্‌নেলার্সদের যে ইউনিয়নটি প্রতিষ্ঠা হয়, তার পুরোভাগে বাল গঙ্গাধর তিলক এবং 'মারাঠী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীকেলকর ছিলেন আইনগত পরামর্শদাতা। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের এই সিগনেলার্স শ্রমিকেরা যে ঐতিহাসিক ধর্মঘট* পালন করেছিলেন, তিলক'এর 'কেশরী' পত্রিকা সরাসরি সে ধর্মঘটের সমর্থনে অবতীর্ণ হয় এবং তাঁরই উদ্যোগে ধর্মঘটীদের সাহায্যের জন্যে অর্থ সংগৃহীত হয়। এখান থেকেই তিনি ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলন বোম্বের চৌহদ্দির মধ্যেই রুদ্ধ হয়ে ছিল না, সারা ভারতে তার ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৫-৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে সরকারের পোস্টাল ও প্রেস বিভাগ এবং

---

* ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জি, আই, পি, রেলওয়ে সিগনেলার্সদের ঐতিহাসিক ধর্মঘটের কাহিনী: 'ভারতীয় ধর্মঘট ইতিহাসের কালপঞ্জী' গ্রন্থে প্রকাশিত হবে।

বস্ত্র-চট-রেলওয়ে, শিল্পের শ্রমিকদের সঙ্গে কর্পোরেশনের ধাঙড়দের ধর্মঘট উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এইসব ধর্মঘটগুলো নিছক অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধেসংগ্রাম ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের প্রেস কর্মচারীদের ধর্মঘটের ফলে সর্ব প্রথম 'ক্যালকাটা গেজেট' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এরপরেও সরকারী প্রেস কর্মচারীরা ধর্মঘট করেন এবং প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্বের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের যোগাযোগ ঘটে যায়।

ভারত সরকারের প্রেস কর্মচারীরা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে, শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯০৫-৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ধর্মঘটগুলোকে ধ্বংস করার জন্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সব রকমের বর্বরতার পথ নেয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বের একটি বস্ত্র কলের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে, প্যারেলের শ্রমিকদের উপর ডেলাইলী রোডে পুলিস যথেচ্ছ অত্যাচার চালায় এবং বহু শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে। এইসব শ্রমিকের মধ্যে ১৬ বছরের কম বালক শ্রমিকও ছিল। এমন কি শাস্তির নামে বেত্রাঘাতও করা হয়। অবশ্যই এইসব ঘটনাগুলো ঘটেছিল, ব্রিটিশ রাজমুকুটের বিচারশালার বিচারপতিদের রায়ে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর উপর নৃশংসতার শেষ অস্ত্রটি বুলেট দিয়ে উদ্বোধন করে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জামালপুরের ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর গুলি চালিয়ে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শুরুতেই কাঁকিনাড়া জুট মিলের শ্রমিকদের উপর গুলি চালিয়ে ধনী নামে একজন শ্রমিককে হত্যা করা হয়।

১৯০৫-৭ খ্রীষ্টাব্দের শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন ধর্মঘট মজুরি বৃদ্ধি ও ছাঁটাই বিরোধী হলেও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্রবহীন ছিল না, বরং স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্বের গভীর সংযোগ ছিল। ১৯০৬

খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর ধর্মঘটী শ্রমিকদের যে ইউনিয়নটি প্রতিষ্ঠিত হয় তার পুরোভাগে ছিলেন—বিপিনচন্দ্র পাল।

এইভাবে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী নিজস্ব দাবি-দাওয়ার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে অগ্রগামী হয়ে, ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে স্থাপন করে ও রাজনৈতিক চেতনার প্রাথমিক স্তরে প্রবেশ করে এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজনৈতিক চেতনা পরিপূর্ণতা লাভ করে।

গ। শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক অভ্যুত্থান

ভারতের শ্রমিকশ্রেণী সচেতনভাবে গণ-আন্দোলনে অংশ নিতে সুরু করলেন। এবং তার জঙ্গী চেতনার পরিপক্কতা প্রকাশ পেল—১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বের রাজপথে।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় আন্দোলনের অগ্রণী নেতা তিলককে যখন সরকার গ্রেপ্তার করে, তখন তার প্রতিবাদে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে বোম্বের রাজপথে পুলিসের সঙ্গে ব্যারিকেড লড়াই হয়।

বাল গঙ্গাধর তিলক ছিলেন ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নেতা। জাতীয় আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা গণ-চেতনার উন্মেষ ও গণ-আন্দোলনকে দুর্বার করে তুলেছিল। জাতীয় আন্দোলনের অন্যান্য নেতার সঙ্গে তাঁর চিন্তার তফাত ছিল। ঔপনিবেশক শোষণই যে শ্রমিকশ্রেণীর কল্যাণের মূল বাধা এটা তিলক ভেবেছিলেন এবং ঔপনিবেশিক জোয়াল ভাঙার জন্য তীব্র গণ-আন্দোলনই ভারতের গণমুক্তির উপায় এটা সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন তিনি; এবং এই ক্ষেত্রেই তাঁর সঙ্গে ছিল অন্যান্য নেতার প্রধান বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু। স্বভাবতই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকবাদীদের দৃষ্টিতে তিলক হয়ে উঠেছিলেন একটি অবাঞ্ছিত শক্তি। ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন অনুভব করেছিল, তিলককে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জুনের সন্ধ্যায় ক্রাফোর্ড মার্কেটের কাছে তিলকের বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এসপ্লানেড পুলিস কোর্টের জঘন্য লক-আপে পুরে রাখা হয়।

তিলককে শুধু মাত্র গ্রেপ্তার করেই ব্রিটিশ শাসক খুশি রইল না; পুলিস প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে সেই দিন রাত্রেই (তিলকের গ্রেপ্তারের দিন) তাঁর পুনার গাইকোয়াড ভবনে হামলা করে তাঁর পরিবার পরিজনদের সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করে তাদের বাড়ি থেকে রাস্তায় বের করে দেয়। পুলিসের এই কুকর্মের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কীর্তি করে ব্রিটিশ সরকার; তা হল 'কেশরী' ও 'মারাঠী' অফিস তালাবন্ধ করে দেওয়া। তাঁর গ্রেপ্তারের পরের দিন পুলিস তিলকের বাড়ি ও পত্রিকার অফিস আবার তন্নতন্ন করে 'বিপ্লবের' ষড়যন্ত্রের সূত্র আবিষ্কারের অনুসন্ধান চালায়। গলদঘর্ম পুলিস 'মহা আবিস্কার' করে একখানি পোস্টকার্ড, যাতে লেখা ছিল দু'খানি বইয়ের নাম।

এই পোস্টকার্ড পুলিস কোর্টে হাজির করে প্রমাণের চেষ্টা করে যে, তিলক বোমা তৈরির ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে জড়িত। আসলে সাংবাদিক তিলক বই দু'টির নাম সংগ্রহ করে লিখে রেখেছিলেন তৎকালীন সরকারের এক্সপ্লোসিভ অ্যাক্ট-এর বিরুদ্ধে লেখার জন্য।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন পুলিস বোম্বের চীফ প্রেসিডেন্সী কোর্টে তিলককে উপস্থিত করে। তাঁকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৫ ও ১৫৩ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়। সরকারী উকিলের সওয়ালে বলা হয় যে, কেশরী পত্রিকায় একটি আপত্তিকর সম্পাদকীয় লেখার জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে।

পরে সরকারী উকিল আরও একটি সম্পাদকীয় তুলে অনুরূপ অভিযোগ করেন।

তিলকের জামীনের আবেদন আদালত অগ্রাহ্য করে।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই থেকে তিলকের বিচার শুরু হয় এবং ২২শে জুলাই শেষ হয়। তিলককে সাজা দেবার জন্যে ব্রিটিশ 'প্রভুরা' সব রকমের ব্যবস্থাই আগে থেকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। অবশ্যই এক্ষেত্রে আর একটি ঘটনা আমাদের মনে রাখা দরকার, ব্রিটিশ শাসকরা তিলককে এই প্রথমবারই জেলে পোরার ব্যবস্থা করে নি, ইতিপূর্বে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে একবার জেলে বন্দী করে রাখা হয়। সেই সময় তিলকের পক্ষে যিনি মামলা পরিচালনা করেছিলেন ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের বিচারে তাঁকেই (জে, ভি, ডাভর) বিচারপতির আসনে দেখা যায়। তাঁর পক্ষে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস নয়, ইংরেজ শাসকদের এটি ইচ্ছাকৃত ব্যবস্থা। বিচারপতির সঙ্গে জুরিদের ব্যবস্থাটি আরও পরিহাসজনক। নয় জন জুরির মধ্যে ছিলেন সাত জন ইউরোপিয়ান বংশোদ্ভূত ও দু'জন ভারতীয় পার্শি। ভারতীয় ময়দানে বিচারের নামে ব্রিটিশ কোম্পানীর যে সার্কাস খেলা শুরু হ'ল, তাতে 'ক্লাউন' হিসাবে আবির্ভূত হল সরকার পক্ষের এডভোকেট: একজন ব্রিটিশ। আর তিলকের মারাঠী ভাষায় লেখা প্রবন্ধ দু'টি ইংরেজীতে অনুবাদ করার জন্যে কোর্টে যাকে হাজির করা হয়েছিল তিনি অবশ্যই একজন মারাঠী ভাষার 'পাণ্ডিত', এ'দুজনের 'চমকপ্রদ' খেলা দর্শকদের মনঃপূত না হলেও, অবশ্যই বিচারপতি মুগ্ধ হয়েছিলেন।

বালগঙ্গাধর তিলক নিজেই নিজের সওয়াল করেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্যে উপস্থিত ছিলেন—ব্যাপটিস্টা, এম এ জিন্না, প্রমুখ ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ। তিলক ছয় দিন ধরে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি খণ্ডন করেন। তিনি

সরাসরি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন যে, তাঁর মারাঠী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ দুটি ইংরেজী ভাষায় বিকৃতভাবে অনূদিত করে কোর্টের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। তিলক কোর্টের সামনে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি খণ্ডন করার মধ্যেই সওয়াল সীমাবদ্ধ রাখেন নি, তিনি সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোস খুলে দিয়েছিলেন। সেই দিন পর্যন্ত কোন ভারতীয় নেতাকে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিরুদ্ধে এমন বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায় নি, তিলক জানতেন তাঁর সাজা হবে। তবু তিনি যে-ভাবে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কঠিন ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে স্বদেশবাসীর জন্মগত অধিকারকে কোর্টের সামনে উপস্থিত করেছিলেন—সে যুগে তা' ছিল বিস্ময়কর। তিনি সরাসরি *বলেন যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশক শাসনের বিরুদ্ধে স্বদেশের মুক্তির জন্য* এবং স্বদেশবাসীরই দেশকে শাসন করার অধিকারের দাবিতে যে কোন আন্দোলনের সপক্ষে দাঁড়াবার অধিকার তাঁর আছে। এবং সে-অধিকারের সংগ্রাম তিনি করছেন।

বালগঙ্গাধর তিলক যখন দেশের পক্ষ হয়ে কোর্টে দাঁড়িয়ে অধিকার রক্ষার সংগ্রাম করছিলেন—সে সময়ে ভারতীয় জনগণ ও শ্রমিক-শ্রেণী নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। তিলকের গ্রেপ্তারের দিন থেকে রায় বের হবার দিন পর্যন্ত ধর্মঘট, হরতাল, ছাত্র-শ্রমিক ধর্মঘট ও বিক্ষোভ সারা বোম্বে এবং গ্রেপ্তারের দিন পুনা শহর তোলপাড় করে তোলে; আসন্ন সংগ্রামের মহড়ায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল—বিশেষ করে সেদিনের বোম্বে।

তিলকের গ্রেপ্তারের রাত্রে তাঁর বাসভবনের চতুর্দিকে সশস্ত্র পুলিসের মহড়ায় পুনার ক্ষুব্ধ মানুষ একে একে জমায়েত হয়ে যেমন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং সহস্র সহস্র কণ্ঠে 'তিলক মহারাজ'

কি জয়'ধ্বনি দিয়ে অনুপস্থিত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে থাকেন তেমনি তার পর দিন নেতার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানিয়ে পুনার মানুষ ২৫শে জুন 'সাধারণ হরতাল' পালন করেন। আর এই সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে পুনার ছাত্রদের ধর্মঘট, ভারতের ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটাও এক লাল তারিখ। কারণ, এটাই ভারতের ছাত্রদের প্রথম ধর্মঘট। কোন জননেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এই প্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদ, ভারতের গণ-আন্দোলনের নতুন দিক পরিবর্তনের সূচনা। আর সে-নতুন দিনের আলো দেখা দিল—বোম্বের রাজপথে।

তিলক মামলার বিচারপতি মিঃ ডাভর যেদিন গভীর রাত্রে তিলক'কে ছ-বছর কারাদণ্ডের সাজা ও এক হাজার টাকা জরিমানার কথা ঘোষণা করলেন—সেদিন থেকে বোম্বের রাজপথে জনগণের ব্যারিকেডের শুরু—আর সারা জুলাই মাস ধরে তার বিস্তার। তিলকের বিচার চলাকালীন প্রতিদিন কোর্ট প্রাঙ্গণে হাজার হাজার মানুষ (যার মধ্যে বস্ত্র শিল্পের শ্রমিক প্রধান অংশ) জমায়েত হতেন, স্লোগান দিতেন, ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভে অসংখ্য পথ-সভার অনুষ্ঠান করতেন। কোন ব্রিটিশ অধিবাসীদের পক্ষে সে-সময়ে পথ চলা ছিল বিপজ্জনক। এই রকম পথচারীকে মারমুখী জনতার হাতে নিগ্রহ হতে হ'ত। তখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের বিশাল এক রূপ।

তেইশে জুলাই থেকে জনতার প্রতিবাদ-আন্দোলন রাজপথে ব্যারিকেড-লড়াইয়ের রূপ নেয়।

তিলকের বিচারের রায় বাতাসের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। সমস্ত বোম্বের শ্রমিক তল্লাট জুড়ে বিক্ষোভের আগুন। সারারাত জুড়ে মহল্লায় মহল্লায় গোপন বৈঠক, শ্রমিকদের প্রতিবাদের প্রস্তুতি।

তাই ২৩শে জুলাই ব্রিটিশ শাসকরা হঠাৎ চমকে ওঠে। দেখে,

পথে হাজার হাজার সুতাকল শ্রমিক। তাদের মুখে আওয়াজ : তিলক মহারাজ কি জয়; পথ পরিক্রমা করে শ্রমিকরা সমস্ত শহরকে আবার সঞ্জীবিত করে।

তিলকের মুক্তির দাবিতে ধর্মঘটের পরিকল্পনা হয়। এক দিনের মধ্যে বোম্বের শ্রমিকদের ধর্মঘটের প্রস্তুতির দৃষ্টান্ত ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের এক সমুজ্জ্বল অধ্যায়।

সেদিন ২৪শে জুলাই। বোম্বের লক্ষ শ্রমিকের সফল ধর্মঘট। ধর্মঘটের পর তিলকের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ জানাতে জানাতে শ্রমিকরা এগোয়। পথ রোধ করে দাঁড়ায় বেয়নেটে সজ্জিত বিরাট পুলিস বাহিনী।

দাম্ভিক সাদা চামড়ার পুলিস অফিসার পথ রুখে বলে : হট যাও, থমথমে শ্রমিকের মুখ দৃঢ় হয়ে ওঠে ; পাল্টা জবাব গগন ফাটিয়ে দেয় : নেহি।

তার পর কিছুক্ষণ থমথমে অবস্থা। জনতার পথ ছেড়ে দেওয়ার কোন লক্ষণ নেই। আবার পুলিসের হুঙ্কার। পাল্টা হুঙ্কার দেয় শ্রমিক : তিলক মহারাজ কি জয়।

কোন রকম সতর্ক না করে পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিস। লাঠি, গুলির শব্দ। শ্রমিকের রক্তে ভেসে যায় বোম্বের রাজপথ। সাদা অফিসার হাঁকে : হট যাও।

লক্ষ কণ্ঠের জবাব : নেহি। বাতাসে গম গম করতে থাকে স্বর। চতুর্দিকে চিৎকার : তিলক মহারাজ কি জয়।

জনতা সেদিন পালিয়ে যায় নি। হাতের কাছে যা কিছু পায়, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়ায় পুলিসের বিরুদ্ধে। পুলিসের উপর ইট বৃষ্টি হতে থাকে। বেপরোয়া পুলিস আবার রুখে দাঁড়ায়। জনতাও রুখে পুলিসের হাত থেকে লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে আঘাত করে।

২৪শে জুলাই ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে আর একটি পথ-নির্দেশ, ব্যারিকেড-লড়াই।

পুলিসের গুলিতে কয়েক শ' মানুষ খুন হয় আর জখম হয় আরও বহু। আর এই ব্যারিকেড লড়াইয়ে অভূতপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে যিনি শ্রমিক মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সেই গণপদ গোবিন্দকে পুলিস নির্মমভাবে হত্যা করে। আর মিছিলের আর এক নেতা অল্পবয়সী বালকের কথা মানুষ ভোলে নি যে নেতৃত্ব দিচ্ছিল মিছিলের; তাকেও পুলিস বুলেটে শহীদ হতে হয়। যদিও সেই মিছিলের ভিড়ে কেউ তাকে চিনতে পারেনি কিন্তু তার নাম না জানা গেলেও সে এখনো বোম্বায়ের শ্রমিক-বস্তির তল্লাটে লোকগাথা হয়ে আছে।

ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এই প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রাম, বোম্বের কোন এক রাজপথে আটকে ছিল না। বোম্বে শহরটি হ'ল, বস্ত্রশিল্পের শ্রমিক অধ্যুষিত নগরী। সংগ্রাম রাজপথ ও গলিপথে ছড়িয়ে পড়েছিল আর সেই সংগ্রামকে নিস্তব্ধ করে দেবার জন্য ব্রিটিশ ফৌজ বোম্বের পথে আরও বেশি করে নামল। বোম্বের কেন্দ্রীয় এবং সুবৃহৎ রেলওয়ে স্টেশনের নিকট সংগ্রামী জনতার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর লড়াইটি ছিল আরও উজ্জীবিত। সংগ্রামী শক্তি বাড়ি ও গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে ইট হাতে ক্রমাগত বুলেটের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকলেন। এই সংগ্রামে বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন, জি, আই পি, রেলওয়ে কারখানার শ্রমিক বাহিনী। অবশ্যই তাঁরা কারখানায় ধর্মঘট করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রাম রাজপথ থেকে গলিপথে এবং রেলওয়ে লাইনে সম্প্রসারিত হয়েছিল। সংগ্রামী জনতা যখন জানতে পারলেন যে, ব্রিটিশ ফৌজ আরও শক্তিশালী

করার জন্যে পুনা থেকে আরও ফৌজ ট্রেন যোগে আসছে, সংগ্রাম বাহিনী সে দিকে ধাবিত হলেন—রেলপথে অবস্থান করে ট্রেনের গতিকে রেল লাইনের উপর নিথর করে রাখলেন। ট্রেনযাত্রী ফৌজী বাহিনীর সঙ্গে জনতার খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। রেল লাইনে পাথর টুকরো দিয়ে জনতা ফৌজীর সঙ্গে মোকাবেলা করলেন। গুলি চললো —কত যে শহীদ হ'লো কে জানে!

সে দিনের সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের এমন ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল যে, তৎকালীন বোম্বের ব্রিটিশ গভর্নরকে পুনা থেকে বোম্বে আসার পথে নিজেকে রক্ষার জন্যে দু'বাহিনী ফৌজ সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হয়েছিল।

ভারতে প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রামের সে ঐতিহাসিক দিনগুলি ভারতের কোন লিখিত ইতিহাসে, ইতিহাসবিদরা স্থান দেয় নি। এমন কি যে বোম্বে নগরী কংগ্রেসকে জন্ম দিলে—সে সব নেতারা সেদিন ছিলেন নিশ্চুপ। জুলাই-এর শীত তাঁদের মুখের বিবৃতিকে জমাট করে দিয়েছিল, না, তখনও তাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট থেকে সুযোগের ভিক্ষার আশায় অন্ধ আবেগ নিয়ে অবস্থান করেছিলেন? এরা বিশ্বাসঘাতকতা করলেও সংগ্রামী জনতা অপেক্ষায় থাকে নি। ইতিহাসের ভূমিকা তাঁরা পালন করে।

প্রায় মাসব্যাপী বোম্বের সশস্ত্র সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী পুরোভাগে থাকলেও, সে শক্তির সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর একটি অংশ প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত ছিলেন। সে দিনের সংগ্রামে শতশত শ্রমিক ও জনতা যেমন মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তেমনী ২৫ বছর বয়স্ক একজন গুজরাট ব্যবসায়ী কেশবলাল কাঞ্জীও শহীদ হয়েছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান সমস্ত সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ ও মিলিত হয়ে আরব সাগরের তীরে ইতিহাসের ভূমিকা পালন করেছিলেন। ব্যবসায়ীরাও সংগ্রামী

জনতাকে সস্তাদরে খাদ্য সরবরাহ করে এবং সমস্ত শক্তি নিয়ে সংগ্রামে মিলিত হয়ে, সংগ্রামের জাতীয় মোর্চা গড়ে তুলেছিলেন।

বোম্বের এই সশস্ত্র সংগ্রাম কোন স্বতস্ফূর্ত ঘটনা ছিল না। মিছিলের পর মিছিল আর ধর্মঘটের পর ধর্মঘট এবং সংগ্রামী জনতার হাতে তিলকের ছবি এবং শ্লোগান ও পোস্টার আর কণ্ঠে ধ্বনি, এসব দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, সংগঠিত শক্তির চেতনা সংগ্রামী ফৌজের মধ্যে ছিল। একথা সত্য যে, সংগ্রামের কোন সুসংগঠিত নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল না। সংগ্রামের ময়দানে নেতা সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাঁরাই সেনাপতি হয়েছিলেন এবং সংগ্রামী ফৌজের সঙ্গে পুরোভাগে থেকে বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-এর অভ্যুত্থানে কতজন শহীদ হয়েছিলেন, ভারতীয় কোন ইতিহাসে সে তথ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। তৎকালীন জনৈক রুশ কাউন্সিল তাঁর সরকারের নিকট একটি বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন যে, সেদিনের সংগ্রামে দু'শত জনের মৃত্যু হয়েছে। সংগ্রামের ঘটনা থেকে আমাদের মনে হয়েছে— সে সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

সে দিনের সংগ্রামের শহীদের স্মৃতির চিহ্ন বোম্বের রাজপথে কোন স্মৃতি-ফলক সাম্রাজ্যবাদীরা যেমন রাখেনি, তেমনই আমাদের স্বদেশী সরকারও এটা করবার প্রয়োজন বোধ করেনি। কিন্তু সেদিনের ইতিহাসের নায়কেরা নিজের রক্ত দিয়ে মাতৃভূমির মুক্তির সংগ্রামে— রাজপথে রক্তাক্ষরে যে-ইতিহাস সৃষ্টি করে রেখে গেছেন, বোম্বের বুকে দাঁড়িয়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক তা তাঁদের স্মরণ-চিহ্ন হিসেবে বংশানুক্রমে বয়ে চলেছেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই সংগ্রামের গুরুত্ব ভারতীয় জাতীয় নেতারা

উপলব্ধি করতে না পারলেও সহস্র মাইল দূরে বসে রুশ বিপ্লবের নায়ক লেনিন তা' মূল্যায়ন করে বলেছেন :

"ভারতে ইতিমধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন রাজনৈতিক গণ-সংগ্রামের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং ঘটনা যখন এই তখন ভারতে রুশ ধরনের বৃটিশ শাসনের ধ্বংস অনিবার্য।"

এই অধ্যায়ের জন্য তথ্য সংগৃহীত করা হয়েছে প্রধানতঃ তৎকালীন Time India পত্রিকা থেকে। কিন্তু বহু ঘটনা সংগৃহীত করা হয়েছে তৎকালীন প্রত্যক্ষদর্শী বোম্বের ব্যক্তি বিশেষের নিকট থেকে। ভবিষ্যতে এই বিষয়ের উপর আলাদা একটি পুস্তক (Revolt—1908) লিখে তা' বিবৃত করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়

ভারতে কারখানা আইনের জন্ম

ক। আন্দোলনের সূচনা

ভারতে কারখানা আইন প্রণয়নের কথা প্রথম বলেন ব্রাহ্মনেতা শশীপদ ব্যানার্জী। ১৮৭০ সালে তিনি এই দাবিতে প্রকাশ্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এবং ১৮৭১ সালে ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়ে এই দাবির কথা ব্রিটেনবাসীদের জানান এবং তাঁর দাবির পক্ষে তখন তিনি জনসমর্থন পান।

কারখানা আইনের দাবিতে বাঙলা দেশে আরও যে কয়েকজন অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখ্য। ব্রিটিশ চা-বাগিচা মালিকদের চোখে ধূলি দিয়ে তিনি আসামের বাগানে ঘুরে চা-শ্রমিকদের জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করেন এবং চা-শ্রমিকদের অসহনীয়, "অ-মানবিক" জীবন যাত্রার কথা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। চা-বাগিচা মালিকদের কুকীর্তি ফাঁস হয়ে পড়লে হন্যে হয়ে তারা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে খুঁজে বেড়াতে থাকে, তারা আদেশ জারি করে দেয় : যেখানে দক্ষিণারঞ্জনকে পাও, ধর অথবা গুলি করে মারো। কিন্তু দক্ষিণারঞ্জনকে তারা পায় নি, তিনি আত্মগোপন করেই চা-শ্রমিকদের জীবনযাত্রার খোঁজ খবর নিতে থাকেন।

শশীপদের মুখে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা শোনার পূর্বে

ইংলণ্ডের মানুষ একজন ব্রিটনের মুখেই ভারতের শ্রমিকদের কথা শুনেছিলেন ; সেই সমাজসেবী ব্রিটনের নাম মিস কারপেনটার।

মিস কারপেনটার ১৮৭০ সালে ভারতে এসে ভারতের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে গেছেন। ভারতের শ্রমিকদের দাবিকে তিনি ইংলণ্ডের সম্মুখে তুলে ধরেন, তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন' সংগঠন মারফত। এই সময় শশীপদের সঙ্গে মিস কারপেণ্টারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয় এবং দুজনে মিলে ইংল্যাণ্ডে বহু জমায়েতে কারখানা আইন প্রণয়নের দাবি তোলেন। এই দাবি এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে এর কণ্ঠস্বর ইংলণ্ডের 'হাউস অব লর্ডসে' প্রতিধ্বনিত হয়েছিল : বিভিন্ন কণ্ঠস্বরে।

ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর জন্য কারখানা আইনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ 'স্ত্রী মজুর' নামে 'সাধনা' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি তখন লেখেন, "কারখানার মজুরদের লইয়া য়ুরোপে আজকাল ক্রমিক আন্দোলন চলিতেছে।

"সমাজের হিতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কারখানার মজুরদের সম্বন্ধে য়ুরোপে দু'টা একটা করিয়া আইনের সৃষ্টি হইতেছে।"

কারখানা আইনের দাবিতে ঘরে ও বাইরে সমর্থন পাওয়ায়, এই আন্দোলন আরও জোরদার হল। এছাড়া ১৮৭৩ সালে বোম্বের সুতাকলের কটন বিভাগের সরকারী কর্তা যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার শোচনীয় এক চিত্র ধরা পড়ে এবং পরোক্ষে তার রিপোর্ট শ্রমিকদের দাবিকে আরও জোরদার করে। তার রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বোম্বের স্ত্রী ও শিশুদের কাজের ঘণ্টা ছিল দীর্ঘ। তিনি আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য দেন যে, কারখানায় অল্প বয়সের শিশুদের পর্যন্ত খাটানো হয়।

একই সময়ে বোম্বের মিণ্ট মাস্টারও কারখানায় শিশু শ্রমিকদের

দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেন। এবং এই দুজনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তখনকার দিনে কারখানা শ্রমিকদের 'সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত' পর্যন্ত কাজ করতে হ'ত এবং শিশু ও নারী শ্রমিকেরা এই নিয়ম থেকে অব্যাহতি পেত না। আরও জানা যায় যে, কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটা ছিল স্বাভাবিক নিত্যকার ঘটনা।

এই ধরনের সরকারী স্বীকৃতির ফলে, কারখানা আইনের উদ্যোক্তাদের আন্দোলন আরও জোর পায়।

১৮৭৫ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া বোম্বে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাউস অব কমন্স'-এ বলেন যে, "তিনি জানতে পেরেছেন যে, শিল্প কারখানায় ছ' বছরের শিশুদের কাজ করান হয় এবং তারা প্রতিদিন ২।৩ মাইল দূরবর্তী এলাকা থেকে পায়ে হেঁটে কারখানায় উপস্থিত হয় এবং তাদের কাজের সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত।"

ইংলণ্ডের সমাজসেবীরা ভারতে কারখানা আইনের প্রবর্তনের দাবিতে যে আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন, তাঁরা অনেকেই মানব-হিতৈষী ছিলেন, কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্যে ইংলণ্ডের বস্ত্র শিল্পের মালিকদের একটি সক্রিয় ষড়যন্ত্র ছিল। ইংলণ্ডের মিল মালিকেরা ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর জন্যে দয়া করে কারখানা আইনের দাবি তোলে নি। তাঁদের ব্যবসায়ী স্বার্থে, সেই আন্দোলনে তারা যোগ দিয়েছিলেন। ভারতের সস্তা কাঁচামাল ও সস্তা মজুরি আর দীর্ঘ কাজের ঘণ্টার সুযোগ সুবিধাগুলো নিয়ে, বস্ত্রের উৎপাদনের পড়তা খরচ ছিল কম, যার ফলে ব্রিটিশ উৎপন্ন-দ্রব্য ভারতীয় বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছিল না। সেই জন্যেই ভারতের বস্ত্রশিল্পে উৎপাদন খরচে একটি প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলার জন্যে কারখানা আইনের দাবি তাঁরা উত্থাপন করেছিলেন।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাঞ্চেস্টারের চেম্বার অব কমার্স ব্রিটিশ সরকারের ভারত সচিবের কাছে এক প্রতিনিধি পাঠিয়ে দাবি করেন যে, ভারতে ব্রিটিশ ফ্যাক্টরী আইনের প্রবর্তন করা হোক। ফলে, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ ব্রিটিশ সরকার ইংলণ্ডের লর্ড সভায় বসে ভারতে শ্রমিকদের অসুবিধাগুলো তদন্তের জন্যে একটি কমিশনের কথা ঘোষণা করল। ইতিহাসে যা 'বোম্বে ফ্যাক্টরী কমিশন' নামে বিখ্যাত।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, এই কমিশন শুধু বোম্বে এবং নিকটবর্তী কারখানাগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। এই কমিশনে কারখানা শ্রমিকদের দুর্বিষহ জীবনের তদন্তের জন্যে যে বিষয়সূচী নির্দিষ্ট করা হয় তাতে বলা হয়েছে যে, 'বোম্বে-এর তৎসন্নিকটবর্তী এলাকায় বিশেষ করে, যে সমস্ত নারী, যুবক ও শ্রমিক কাজ করে তাঁদের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করা, কারখানায় বায়ু চলাচলের ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা করা এবং কাজের ঘণ্টার জন্য কোন আইন প্রণয়ন করা উচিত কিনা সেই বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ।

ফ্যাক্টরী কমিশন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরও কারখানা আইনের আন্দোলন চলেছিল। ফ্যাক্টরী কমিশন বোম্বের জন্যে নিয়োগ করা হয়েছিল, বোম্বে ছিল ভারতীয় পুঁজির পীঠস্থান। বোম্বে ছিল ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বী। বাঙলাদেশে ব্রিটিশ পুঁজি তখন গেঁড়ে বসেছে কিন্তু ইংল্যাণ্ডের "মনীষী"দের এখানে কমিশন বসানোর কোন দাবি তুলতে দেখা যায় নি।

ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্প মালিকদের বোম্বের দিকে নজর ছিল তার পরিচয় লর্ডস সভার এক বিবরণী পর্যালোচনা করলে পাওয়া যায়।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে জুলাই আর্ল শেফটস্‌বেরী 'লর্ড সভায়' বলেন যে, আমাদের মনে রাখা উচিত যে, ভারতে কাঁচামাল আছে এবং সেখানে শ্রম-সস্তায় পাওয়া যায়। যদি আমরা সেখানকার উৎপাদকের

উপর বিধিনিষেধ আরোপ না করে ১৬ থেকে ১৭ ঘণ্টা কাজ করতে দিই তবে আমাদের দেশের উৎপাদকদের তুলনায় তাদের অনেক সুবিধে দেওয়া হয়ে যাবে। ফলে আমাদের, ম্যাঞ্চেস্টারে উৎপাদিত দ্রব্য প্রতীচ্য থেকে আমদানীকৃত দ্রব্যের চেয়ে কম দামে বিক্রী করতে হবে।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে কারখানার কাজের ঘণ্টা অনুসন্ধানের তদন্ত হয়।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বোম্বে কারখানা আইনের আন্দোলনের এক নতুন পর্যায়ের শুরু। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন—সরবজী সাপুরজী বেঙ্গলী।

ভারতবর্ষে কারখানা আইনের গোড়াপত্তন ইতিহাসে বেঙ্গলীর নামটি অবিস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। একমাত্র তিনি কারখানা আইনের জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গলী কারখানা আইনের যে খসড়া বিল প্রস্তুত করে বিলি করেন তাতে তিনি উল্লেখ করেনযে,(১) কারখানায় কাজের সময় হবে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত; (২) সপ্তাহে ছ'দিন কাজ চালু থাকবে; (৩) কাজের ঘণ্টা পুরুষদের ১১ ঘণ্টা, মেয়েদের জন্যে ১০ ঘণ্টা ও শিশুদের জন্যে দিনে ৯ ঘণ্টা; (৪) প্রতিদিন কাজে একঘণ্টা বিরতি।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার সারা ভারতের জন্যে কারখানা আইনের প্রবর্তনের কথা চিন্তা করেন। কিন্তু ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তা ফলপ্রসূ হয়। এই সময়ে ভারত সরকার একটি বিল প্রচার করেন। তাতে বলা হয়েছিল যে শিশুশ্রমিকদের জন্যে দিনে কাজের ঘণ্টা হবে ৮ ঘণ্টা এবং তাঁদের বয়সের সীমা হবে ১২ থেকে ১৬ পর্যন্ত। এবং যে কারখানায় পঞ্চাশ জনের বেশি শ্রমিক উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত আছে তাঁদের বেলায় এই আইন প্রযোজ্য।

খ। প্রথম কারখানার আইনঃ

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের বোম্বে ফ্যাক্টরী কমিশনের বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর জীবন যাত্রার এক ভয়াবহ রূপ প্রকাশিত হয়ে পড়লো। ফ্যাক্টরী কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, সেই সময়ে কারখানায় ৫ থেকে ৬ বছরের শিশুশ্রমিকেরা কাজ করতএবং মাসিক বেতন ছিল দু'টাকা থেকে চার টাকার মধ্যে। কাজের ঘণ্টা ছিল সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এবং এই সময় শ্রমিকেরা একনাগাড়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতেন। এটাই ছিল তখনকার দিনে কাজের স্বাভাবিক নিয়ম। এ প্রসঙ্গে মনে রাখার প্রয়োজন যে, তখনও কারখানাগুলোতে বৈদ্যুতি-করণ হয় নি। ফলে, কারখানায় কাজের সময় সূর্যাস্ত পর্যন্ত সীমিত ছিল, নচেৎ আরও দীর্ঘ কাজের সময় নির্ধারিত হত।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বস্ত্রশিল্পে কাজে নিযুক্ত আছেন এমন একজন ব্যক্তি ফ্যাক্টরী কমিশনের সামনে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে বলেন যে, সেই সময়ে পুরুষ শ্রমিকদের মাসিক বেতন ছিল ৬ টাকা থেকে ১৫ টাকার মধ্যে। এবং কোন শ্রমিক বিনা অনুমতিতে কারখানায় অনুপস্থিত থাকলে, প্রতিদিনের জন্যে দুদিনের মজুরি বাজেয়াপ্ত করা হ'ত।

এই রকম এক জংলী ব্যবস্থার মধ্যে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে শ্রমিকশ্রেণী প্রথম কারখানা আইনের মধ্যে দিয়ে কিছুটা আইনত অধিকার আদায় করে নিয়েছিলেন।

ভারতের কারখানা আইনের প্রধান ধারাগুলো ছিল (১) যে কারখানায় কমপক্ষে ১০০ শত জন এবং তদধিক শ্রমিক কাজ করেন ও বছরে চার মাস কারখানা চালু থাকে, সেই সব কারখানায় এই আইন বলবৎ। চা ও কফি শিল্পকে এই আইন থেকে অব্যাহিত দেওয়া হয়েছিল।

(২) শিশুশ্রমিকদের বয়ঃসীমা ৭-১২ বছর করা হয়েছিল এবং কাজের সময় নির্ধারিত করে দেওয়া ছিল দৈনিক আট ঘণ্টা, বিরতি এক ঘণ্টা। একমাত্র শিশু শ্রমিকদের মাসে চারটি ছুটির দিন প্রথম আইনে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

(৩) কারখানার শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য এই আইনে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল।

প্রথম কারখানা আইন বলা চলে শিশু শ্রমিকদের জন্যে আইন। এই আইনের ফলে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে বিশেষ কোন পরিবর্তন সৃষ্টি হয় নি এবং শিশু শ্রমিকদের জন্য যেটুকু সুযোগ এই আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা তখনও গড়ে ওঠেনি। ফলে অরাজকতা পূর্ববৎই রয়ে গেল।

গ। নতুন পর্যায়ের আন্দোলন

অনিচ্ছুক শক্তির হাত থেকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী প্রথম কারখানা আইন আদায় করে; বিজয়ী নিশান যাঁরা ওড়ালেন সেই পতাকার প্রথম সারিতে ছিলেন সমাজহিতৈষীরা।

মনে রাখা দরকার যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটেনে শিল্পের প্রসার গভীর হয়। এবং ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ব্রিটিশ শ্রমিকেরা কারখানা আইনের সুযোগ ভোগ করতে থাকেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নারী ও শিশু শ্রমিকদের জন্য দিনে ১০ ঘণ্টা কাজ আইনতঃ স্বীকৃত হয়, এর পরে ১৯২০ খ্রীঃ-এ শিশুদের কারখানা কাজের বয়ঃসীমা নির্দিষ্ট করা হয় চৌদ্দতে। ভারতে শিল্পযুগের যাত্রারম্ভ হয় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর, অর্থাৎ ত্রিশ বছরের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী শিল্পপতিদের অনিচ্ছুক হাত থেকে কিছুটা সুযোগ কেড়ে নিতে শিখল এবং এই যাত্রারম্ভ পরবর্তীকালে সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীর চেতনার জন্ম সূচনা করে। প্রথম কারখানা

আইনে শ্রমিকশ্রেণীর কিছুটা ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করার পর কারখানা আইনের আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়। আন্দোলন সমাজহিতৈষীর স্তর অতিক্রম করে, সভা-সমাবেশ, গণদরখাস্ত, প্রভৃতি গণআন্দোলনের স্তরে প্রবেশ করে। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন ভারতের প্রথম শ্রমিক নেতা এন, এম লোকাণ্ডে। অন্যদিকে ব্রিটিশ পুঁজিপতি ও তাঁদের সাকরেদরা চুপটি করে বসে ছিল না। তারাও বিভিন্ন সময়ে ভারতে প্রথম কারখানা আইন সংশোধন দাবি করে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চেস্টারের একজন কারখানা পরিদর্শক বোম্বে উপস্থিত হন এবং আইনের সংশোধনের জন্যে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করেন।

সরকারের পক্ষ থেকে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বারের জন্যে বোম্বে ফ্যাক্টরী কমিশন গঠন করা হয়। যার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি হয়। এবং লোকাণ্ডের নেতৃত্বে প্রথম কারখানা আইনের সংশোধনে দাবিতে এক বিরাট আন্দোলন সংগঠিত হয়।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে থেকে ২৬শে বোম্বের শ্রমিকদের একটি সম্মেলন হয়। ভারতে এটিই ছিল শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম সম্মেলন। এন, এম, লোকাণ্ডের উদ্যোগে সংঘঠিত ঐ সম্মেলন থেকে শ্রমিকশ্রেণী পাঁচটি সুনির্দিষ্ট দাবি উপস্থিত করেন। এবং প্রস্তাবের দাবিসনদ পাঁচ হাজার শ্রমিক স্বাক্ষর করে এক স্মারকলিপি বোম্বে ফ্যাক্টরী কমিশনের কাছে প্রেরণ করে। সম্মেলনে গৃহীত স্মারকলিপিতে বলা হয়; (১) সপ্তাহে একদিন ছুটি (রবিবার); (২) মধ্যাহ্নে আধঘণ্টা কাজের বিরতি; (৩) কাজের সুনির্দিষ্ট সময় ও সকাল ৬টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত; (৪) মাসের পনের তারিখের মধ্যে বেতন প্রদান

(৫) কারখানায় কাজ করতে গিয়ে কর্মরত কোন শ্রমিক সাময়িকভাবে আহত হলে এবং কাজ করতে অক্ষম হলে পুনরায় কাজে যোগদান করা না পর্যন্ত শ্রমিককে পুরো বেতন দিতে হবে। যে শ্রমিক দুর্ঘটনায় একেবারে কাজে অক্ষম হয়ে পড়বেন তার জীবন ধারণের জন্যে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আইনে করতে হবে।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ম্যাঞ্চেস্টারে চেম্বার অব কমার্স ভারতের শ্রমিকদের অতিরিক্ত কাজের ঘণ্টা কমাবার দাবিতে সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। ব্রিটিশ সহোদর 'ভাই'-এর বেয়াদপি দেখে মাদ্রাজের চেম্বার ও কমার্সের সভাপতি, যিনি আবার ব্রিটিশ-বংশোদ্ভূত, সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ওঠেন এবং ব্রিটিশ সরকারকে ওদের মতলবের ফাঁদে না পড়ার জন্য উপদেশ দেন।

এই সব ঘটনা যদিও দু'প্রান্তের পুঁজিপতি গোষ্ঠীর নিজ নিজ মুনাফার অন্তর্বিরোধের প্রকাশ। পুঁজিপতিদের এই অন্তর্বিরোধ পরোক্ষে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর কারখানা আইন সংশোধনের দাবির পক্ষে যুক্তি হয়ে দাঁড়াল।

ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আরও অনেক বিস্ময় বাকি ছিল।

ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর দাবির সমর্থনে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ শনিবার ল্যাঙ্কাশায়ারের একদল বস্ত্রশিল্পের শ্রমিক ব্রিটিশ সরকারের 'ইণ্ডিয়ান অফিসে'র সামনে এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন কয়েকজন ব্রিটিশ এম, পি। তাঁরা হলেন : মিঃ জে, এম, ম্যাকলিন, মিঃ এফ, এস, পাওয়েল, মিঃ জর্জ হয়েল, প্রমুখ। এই বিক্ষোভ মিছিলের উদ্দেশ্য কি ছিল, তা' মিঃ ম্যাকলিনের কথা থেকেই জানা যায়।

মিঃ ম্যাকলিন মন্তব্য করেন যে, এই মিছিল ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র

শিল্প ও শ্রমিকদের এক বক্তব্য নিয়ে এসেছে, যা' ল্যাঙ্কাশায়ারের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিশেষ সমস্যাটিকে তুলে ধরছে বলে প্রতিনিধিরা মনে করেন। বিষয়টি হচ্ছে ভারতীয় মিলগুলিতে যারা নিয়োজিত, তাদের কাজের ঘণ্টা অনেক বেশি ও অতিরিক্ত।১ ব্রিটেনের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকেরা 'ইণ্ডিয়া হাউসের' সামনে শুধু বিক্ষোভ প্রদর্শনই করেননি, সাম্রাজ্যবাদী সরকারী প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ পর্যন্ত করেন এবং ভারতের শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে তাঁদের মনোভাবের কথা প্রকাশ করেন।

যদিও ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকেরা, ব্রিটেনের মালিক-শ্রেণীর ক্রীড়নক হয়ে এক ভূমিকা পালন করলেও ইতিহাসে সেই ঘটনা ভারতে ও ব্রিটিশ-শ্রমিকদের মধ্যে এক ঐতিহাসিক যোগসূত্র এবং সংহতির অঙ্কুর হিসেবে কাজ করেছে।

'ইণ্ডিয়া হাউসের' শ্রমিক সমাবেশের পক্ষ থেকে মিঃ, জে, টি, ফিল্ডি ও এ, বি, অকৃলে, দু'জন শ্রমিক সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সম্মেলন থেকে নারী ও শিশু শ্রমিকদের জন্য আইন করার জন্য এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ঐ সম্মেলনের প্রস্তাব ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে নতুন শক্তি যোগাল।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বোম্বের বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকদের এক ঐতিহাসিক সমাবেশ ঘটল। প্রায় দশ হাজার শ্রমিক ঐ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। এবং ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম দু'জন ভারতীয় নারী শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ দেন। সমাবেশে গৃহীত প্রস্তাবে, সপ্তাহে একদিন ছুটি দাবি করা হয়। এবং দাবির স্মারকলিপি বোম্বে মিল মালিক সমিতির কাছে পাঠানো

১। The time, 1889

হয়। বোম্বে মিল মালিক সমিতি এই প্রথম শ্রমিকদের দাবি মেনে নেয়। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এটিই হল 'সংগঠিত' প্রথম জয়। এই জয়ের গৌরব শত শত শ্রমিকের প্রতীক হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে আছে একটি নাম : এন, এম, লোকাণ্ডে।

ইত্যাকার আন্দোলনের ফলে, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে সেপ্টেম্বর ভারত সরকার একটি কমিশন গঠন করেন। এবং মিঃ বেঙ্গলী কমিশনের একজন সাধারণ সভ্য মনোনীত হন। এন, এম, লোকাণ্ডে ছিলেন এই কমিশনের বোম্বে প্রেসিডেন্সীর আঞ্চলিক প্রতিনিধি। এই কমিশন বোম্বের শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করে। এই কমিশনকে আজকের দিনের তদন্ত কমিশনের পূর্বসূরী বলা যেতে পারে।

এই কমিশনের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে নতুন কারখানা আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুআরি থেকে এই আইন কার্যকরি করা হয়।

এই আইন পূর্ববর্তী আইন থেকে অনেক বেশি প্রগতিধর্মী। আইনের প্রধান প্রধান ধারায় বলা হয়েছে : (১) যে সব কারখানায় কমপক্ষে ৫০ জন এবং তদূর্ধ্ব শ্রমিক কাজ করেন, সেখানে এই আইন কার্যকর করা হবে। প্রয়োজনবোধে প্রদেশ সরকার ঐ আইন ২০ জনের কারখানায় চালু করতে পারবে, (২) নারী শ্রমিকদের দিনে এগার ঘণ্টা কাজ এবং দেড় ঘণ্টা বিরতি; (৩) শিশু শ্রমিকদের বয়ঃসীমা চৌদ্দতে এবং কাজের সময় বেঁধে দেওয়া হয় সাত ঘণ্টায় আর আধ ঘণ্টা বিরতি; (৪) সপ্তাহে একদিন ছুটি।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ১৮৮১—১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দটি আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের এক ঐতিহাসিক যুগ। সমাজ-

দ্বিতীয় যুগ কাটিয়ে উঠে, আন্দোলনের এবং সংগঠনের যুগে সে প্রবেশ করে। আর এই সময়েই শ্রমিকশ্রেণী বহু নতুন নতুন অধিকার অর্জন করে।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কমিশনে, নিজেদের প্রতিনিধি পাঠানোর গৌরব অর্জন করে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী।

ঘ। প্রথম পর্বের শেষ পর্যায়ের আন্দোলন

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কারখানা আইন এবং তার দশ বছর পর সংশোধিত কারখানা আইন অর্জনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী যেন ঝিমিয়ে পড়ল। যে ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হয়েছিল; এন, এম, লোকাণ্ডের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে ভবিষ্যৎ যেন সাময়িকভাবে থমকে দাঁড়াল। প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি বছরের আগে আর এমন কোন শক্তির আবির্ভাব ঘটলো না, যাঁরা এই অভ্যুত্থিত শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। অথচ এই সময়কালে ভারতে এক বিরাট রাজনৈতিক অভ্যুদয় ঘটেছিল। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত ভারতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক বিরাট স্রোত বয়ে যায়। সেই স্রোতস্বিনী ধারার মধ্যে শ্রমিক-শ্রেণীর রাজনৈতিক তরঙ্গ দেখা গেলেও, কারখানা আইনের দাবিতে কোন উত্তাল দেখা যায় নি।

সেই উদ্যোগ হাতে নিয়ে রেখেছিল ম্যাঞ্চেস্টারের শিল্পপতিরা। ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যের উপর, নিজেদের প্রতিযোগিতার সামর্থ্য বজায় রাখার জন্য তাঁরা প্রতিনিয়ত ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, যাতে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর জন্যে উন্নততর কারখানা আইন লিপিবদ্ধ করা হয়।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ, দেশে দেশে শ্রমিকদের কারখানা আইনের দাবিকে জোরদার করে তুলেছিল। এই সময়ে প্যারিসে 'এসোশিয়েশন ফর লেবার লেজিসলেশন' নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্ম হয় এবং ঐ সংগঠন ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যায়।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাঙ্কাশায়রে বস্ত্রশিল্পের শ্রমিক পক্ষ থেকে পুনর্বার সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া'-এর কাছে এক প্রতিনিধি দল দেখা করে ভারতীয় পুরুষ শ্রমিকদের জন্যে কাজের ঘণ্টা বিধিবদ্ধ করার দাবি পেশ করেন।

এই প্রথম ভারতের পুরুষ শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা আইন সীমাবদ্ধ করে দেবার জন্য দাবি তোলা হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বের বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকদের একটি সভায় কাজের ঘণ্টা কমাবার দাবি করা হয়।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বে বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকেরা কাজের ঘণ্টা বেঁধে দেবার দাবিতে ধর্মঘট করেন। এই সব সঙ্ঘবদ্ধ ঘটনার চাপে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'টেক্সটাইল কমিশন' এবং ১৯০৭ খ্রীঃ-এ 'ফ্যাক্টরী লেবার কমিশন' গঠন করা হয় এবং উভয় কমিটি বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকদের জন্য কাজের ঘণ্টা বিধিবদ্ধ করার পক্ষে মত প্রকাশ করে রিপোর্ট" দাখিল করেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি নতুন বিল আইন-সভায় উপস্থিত করা হয় এবং ১৯১১ খ্রীঃ-এ আইন হিসেবে কার্যকর করা হয়।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আইনের প্রধান প্রধান ধারাগুলো ছিল: (১) বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে সব বস্ত্র কারখানায় ১১ ঘণ্টার বেশি কাজ হয় সেখানে নিয়োজিত প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও শিশুর জন্য যথাক্রমে বারো ও ছয় ঘণ্টা কাজ।

(২) অন্যান্য কারখানায় যেখানে পূর্বে শিশু ও নারীদের জন্য

দিনে যথাক্রমে সাত ও এগারো ঘণ্টা নির্ধারিত ছিল সেখানে এখন সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে সাতটার মধ্যে কাজের ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হল।

(৩) এছাড়া শিশুদের বয়স সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে এবং কাজ করতে সক্ষম শারীরিক অবস্থার বিবরণ পেশ করতে হবে।

(৪) কারখানায় শিশু ও নারীদের কাজের ব্যাপারে বিপজ্জনক ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়ঃ যথা, মিলের কোন চলন্ত অংশ নেওয়া, পরিষ্কার করা, মেশিন চলা অবস্থায় কাজ করা এবং কোন চলন্ত কাজে যোগান দেওয়া প্রভৃতি।

ব্রাহ্ম নেতা শশীপদের নেতৃত্বে ভারতে কারখানা আইনের দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকেরা ভারতের পুরুষ শ্রমিককের কাজের ঘণ্টা বেঁধে দেবার যে দাবি উপস্থিত করেছিলেন, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে নতুন কারখানা আইন আদায়ের মধ্যে দিয়ে, কারখানা আইন আন্দোলনের প্রথম যুগের পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

ভারতে কারখানা আইন সৃষ্টির প্রথম পর্বের ইতিহাস এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে—১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে আর এক জয়ের মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় পর্ব-অনুষ্ঠানের উদ্বোধন!

অষ্টম অধ্যায়

ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্ম

(ক) শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণের ধারা

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বের রাজপথে শ্রমিক শ্রেণীর যে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তার কয়েক দিনের মধ্যে ইতি ঘটলেও, ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু এই কথাও সত্য যে, এত বড় সংগ্রামী ঘটনার কোন ছাপ পরবর্তী কয়েক বছরে বোম্বের শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে লোকাণ্ডের নেতৃত্বে বোম্বের সূতা কলের শ্রমিকদের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে এসে শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রামী চেতনায় পরিপক্কতা দেখিয়েছিল তার পরিপ্রকাশ তখনকার ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনে হয় নি। তখন বরং শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম সমাজসেবা মূলক কাজের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। সেই অচল আয়তন ভেঙ্গে শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রামী চেতনা নিয়ে আবির্ভূত হতে পারল শুধু প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তিকালের পরেই। দীর্ঘকাল শ্রমিক শ্রেণীর এই নীরবতা কেন?

১৯০৫-৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক জীবনে যে গণউন্মেষ ঘটেছিল, তার পুরোভাগে ছিল বুর্জোয়া ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এমন এক কংগ্রেস নেতৃত্ব যাঁদের ধ্যানধারণাও আবার ছিল অবিপ্লবী।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিলককে জেলে পোরা হয়েছিল এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এই জননেতাকে ব্রিটিশরা মুক্তি দিয়েছিল।

সুতরাং ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জনগণের চেতনা এক সংগ্রামী স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে বিলীন হয়ে গেল। কোন সংগ্রামী সংগঠনের জন্ম না নেবার ফলে, বোম্বে ও কলকাতার শ্রমিকশ্রেণীর ও জনসাধারণের সংগ্রামী চেতনা একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে, রাজনীতির যে পরিপক্কতা দেখিয়েছিলেন, সে ধারার বিকাশ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে আর দেখা যায়নি।

এই ঘটনার পরিণতিতে শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ ঘটে সমাজসেবা মূলক কাজের যুগের পুনঃ আবির্ভাবের মধ্যে।

১৯০৯—১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বেতে কামগড় হিতবর্দ্ধক সভা, সোশিয়াল সার্ভিস লীগ, সার্ভেন্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রভৃতি গণসংগঠনের জন্ম হ'ল এবং এই সব গণসংগঠন শ্রমিক শ্রেণীর জীবন সমস্যা নিয়ে প্রভূত প্রশংসনীয় কাজ করে যেতে থাকে। এই সমাজসেবা মূলক কাজের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী কালে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আইনের জনক এন, এম, জোশীর আবির্ভাব ঘটেছিল।

এই সময়ে অর্থাৎ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে, ইংলণ্ডে, ওয়েল ফেয়ার লীগ অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যাদের উদ্দেশ্য ছিল: 'ভারতীয় ও বৃটিশ শ্রমিকের কাজের এবং জীবনযাত্রার অবস্থার ঐক্যসাধন'।

এই সময়ে শ্রমিক শ্রেণীর চেতনা সংগঠন আন্দোলনের মধ্যে আবির্ভাব না ঘটলেও ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বেতে কয়েকটি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। সরকারী নথিতে তার প্রমাণ মেলে।

'১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে কয়েকটি শ্রমিক ধর্মঘট হয়, তবে সেগুলি বড় রকমের ধর্মঘট ছিল না। ব্রোচের নর্মদা মিলের শ্রমিকরা এই অভিযোগে ধর্মঘট করে যে, তাদের কাজের সময় ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ, আর তাদের ইলেকট্রিক বাতিতে রাতে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছিল, তাছাড়া তাদের ছিল অন্যান্য ব্যক্তিগত অভিযোগ।'

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বে ইলেকট্রিক সাপ্লাই এণ্ড ট্রামওয়েজ কোং-র ধর্মঘট খুবই বৈশিষ্টপূর্ণ। আধুনিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সংগঠনের অংকুর এই ধর্মঘট প্রস্তুতির মধ্যে দেখা যায়। উক্ত কোম্পানীর বেতন কাটা ও অন্যান্য জুলুমের বিরুদ্ধে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই নভেম্বর শ্রমিকেরা একটি জনসভা অনুষ্ঠিত করে এবং সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয়। এবং সংগ্রামের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে ও কোম্পানীর নিকট স্মারক পত্র দেবার জন্য গণস্বাক্ষর অভিযান শুরু করে। ১লা ডিসেম্বর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর নিকট উক্ত গণদরখাস্ত প্রেরিত হয় এবং তার জবাবে কোম্পানী ৫ই ডিসেম্বর ডিপোতে ডিপোতে নোটিশ দেয়, ফলে শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। উক্ত রাত্রেই শ্রমিকেরা একটি সভা করে পরের দিন থেকে ধর্মঘটের ডাক দেয়। এবং ধর্মঘটের ফলে পরের দিন ভোর বেলায় কোন গাড়ী পথে বের হয় না।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দেও কয়েকটি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে :

"১৯১২ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি স্পিনিং ও উইভিং মিলে কয়েকটি ধর্মঘট হয়, তবে কোনটাই গুরুতর প্রকৃতির হয়নি। সেগুলি প্রধানত মজুরীর পুণর্বিন্যাসের দরুন, কিন্তু যেহেতু শ্রমিক পাওয়া ছিল কঠিন এবং বস্ত্রশিল্পের তখন এক তেজী অবস্থা কাজেই মালিকদের বিরোধাধীন বিষয়গুলি মেনে নিতে হয়েছিল।"

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনে একটি নতুন যুগের আবির্ভাব হয়। এই সময়ে মুকুন্দলাল সরকার ক্লার্কস ওয়েল ফেয়ার এসোশিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ডালহৌসি পাড়ার একটি সওদাগরী অফিসের কর্মচারী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সরকার মুকুন্দলাল হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বাংলা দেশে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গড়ার পেছনে তাঁর প্রয়াস অগ্রণী ভূমিকা হিসেবে পরিচিত হয়ে

থাকবে। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গড়ার পূর্ব্বসূরী।*

এই ভাবে শ্রমিক আন্দোলনের যে ক্ষীণ অগ্রগতি হচ্ছিল, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের ফলে তা' থমকে দাঁড়ায় এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শ্রমিক আন্দোলন এক নতুন যুগের সূচনা করে।

এইভাবে ভারতের সামাজিক জীবনের ভাগ্যাকাশে নূতন সূর্যের উদয় হল।

খ। শ্রমিক সংগঠন গড়ার সূচনা।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তির বছর থেকে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নব জাগরণ দেখা দিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের মুনাফার পাহাড় স্ফীত করে তোলে আর শ্রমিক শ্রেণীর জীবনে আকাশচুম্বি দ্রব্য মূল্যের দুঃসহ বোঝা চাপে। এই সময়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে, ব্রিটীশদের সঙ্গে সহযোগিতা করে অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ সাহায্যের মধ্যে দিয়ে। এই কাজ সংগঠিত হয়েছিল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীজীর নেতৃত্বে। তার ফল ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী হাতে হাতেই পেয়েছিল।

"যে ব্রিটীশরা শাসন করছিল তাদের অনেক গুরুতর এবং অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কাজে কাজেই ভারতের প্রতি নীতিকেও কিছুটা বদল করতে হয়। ভারতে বৃটীশ নীতি খানিকটা নরম হয়ে আসে এবং যুদ্ধকালীন অর্থনীতির সুবিধাদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিতে হয় বলেই এতদিন যেসব চত্বর ছিল অনধিগম্য তাতেও ভারতীয় পুঁজিপতিদের প্রবেশ করতে দিতে হয়।"[১]

---

* সরকার মুকুন্দলালের বিষয়ে বাঙলা দেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। 1. Story of Indian Labour.

জাতীয় নেতৃত্ব ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মেলানোর ফলে, ভারতীয় জনগণ পেল এই পুরস্কার :

"সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধজনিত অবস্থার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই অত্যাবশ্যক পণ্যের দরও চড়তে থাকে। যুদ্ধ শেষ হবার সময়ে শ্রমিকদের অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠে। তাছাড়া যুদ্ধের শেষে ছাঁটাই এবং বেকারত্ব দেখা দেবার সত্যিকারের আশঙ্কাও ছিল।" (২)

প্রথম মহাযুদ্ধের ফলস্বরূপ ভারতের সাধারণ মানুষের জীবন যখন দুর্বিসহ করে তুলেছিল, সেই সময়ে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী পরিচালিত বস্ত্র শিল্পে ডিভিডেণ্ড দিয়েছে ২০০ থেকে ২৫০ ভাগের মধ্যে এমন কি ৩৬৫ ভাগ পর্যন্ত। আর ব্রিটীশ পুঁজিতে পরিচালিত চট শিল্পে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়েছে ১৪০ থেকে ৪০০ ভাগ পর্যন্ত। এই সময়ে শ্রমিক শ্রেণীর জীবন যাত্রার ব্যয়সূচী বেড়েছে, যুদ্ধপূর্ব কাল থেকে সমাপ্তি কাল পর্যন্ত দ্বিগুণেরও বেশী। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণী কোন ক্রমেই, শ্রমিক শ্রেণীর জন্য বেতন ও মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির সামান্য সুযোগাদি দিতে পর্যন্ত অস্বীকার করেছে। আর শ্রমিক শ্রেণীও নীরবে সে মার সহ্য করেনি।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর ইতিহাসের মোড় ঘুরে গিয়েছে। পৃথিবীর মানচিত্রে এক বিরাট অংশ লাল কালিতে ঢেকে গেছে। জন্ম হয়েছে নতুন রাষ্ট্রের। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গোড়াপত্তন কাল থেকে পড়ানো হয়েছিল, ধনী ও গরীব আর শ্রেণী বৈষম্য ভগবানের দান—এটা অবিনশ্বর। কিন্তু সেই গরীব চাষী-মজুর, নিরক্ষর আর নিঃসম্বল সন্তানেরা—পৃথিবীকে দশটি দিন কাঁপিয়ে জন্ম দিল : সোভিয়েত রাষ্ট্র।

১৯১৭ সালে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে নভেম্বর মাসে (পুরাতন অক্টোবর মাস), যে রাষ্ট্রের জন্ম হ'ল, তা দুনিয়ার মেহনতি মানুষের নিজস্ব শক্তির উপর প্রত্যয় জন্মালো আর রুশ বিপ্লবের প্রভাব দেশে দেশে জাতীয় আন্দো-

2. Story of Indian Labour—G. Ramanuja.

মনে নিয়ে এলো এক প্রচণ্ড নবজীবনের জোয়ার। তার থেকে ভারতও মুক্ত ছিলনা।

জাতীয়তাবাদের সঙ্কীর্ণ আবেগের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনকে আর বেঁধে রাখা যায়নি। সংখ্যার দিক থেকে শ্রমিক শ্রেণীর বৃদ্ধি ঘটেছে আর চেতনার দিক থেকে শ্রমিক শ্রেণী আরও সংগঠিত হবার পথে এগিয়ে গেছে। এই সময়ে শ্রমিক আন্দোলনে জাতীয় নেতৃবৃন্দের আবির্ভাব ঘটে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর-কালে শ্রমিক শ্রেণীকে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার যে সব চেষ্টা চলেছিল, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রেলওয়ে শ্রমিকরা সেই প্রচেষ্টার উপর প্রথম আঘাত হানলেন। ১৯১৪—১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আরও কোন ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই, কিন্তু হয়ে থাকলেও তা' ছিল ছোট খাটো সেই রকম একটা কিছু, কিন্তু রেলওয়ে শ্রমিকদের আন্দোলন ছিল বৃহত্তর শক্তির বহিপ্রকাশ।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে করাচীর স্বক্কারে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং জুন মাসে গ্রেট ইণ্ডিয়া পেনিনসুলা রেলওয়ের বোম্বের মাতুঙ্গা ও প্যারেলের কারখানার ৫০০০ হাজার শ্রমিকের কয়েকদিন ব্যাপী ধর্মঘট বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে পুনরায় জি, আই, পি রেলওয়ে কারখানার শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেন। এই আন্দোলনের পোষ্টার লাগিয়ে শ্রমিকদের ধর্মঘটে সামিল হবার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এই সময়ে প্রচার কার্য্যে পোষ্টার লাগানো শ্রমিক আন্দোলনের জীবনে একটি নতুন ঘটনা। রেলওয়ে শ্রমিকদের জুলাই মাসের এই ধর্মঘট আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত চলেছিল। এই সময়ে শ্রমিকেরা ধর্মঘটের বিষয়টাতে সরকারের হস্তক্ষেপের দাবি তোলেন। কিন্তু সরকার তা' করতে অস্বীকার করেন। ফলে ধর্মঘট চলতে থাকে যখন দেখা গেল ধর্মঘট ভাঙ্গা গেলনা, সরকার কোম্পানীর হয়ে দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন এবং বোম্বের সরকার এক বিবৃতি দিয়ে ধর্মঘটীদের কাজে যোগদানের জন্য হুকুম জারী করেন।

জি, আই, পি, রেলওয়ে শ্রমিকদের এই ধর্মঘটের আর একটি বৈশিষ্ট ছিল যে, শ্রমিকেরা একটি সংগঠন তৈরী করেন, তার নাম দেওয়া হয়েছিল— বোম্বে লেবার এসোশিয়েশন এবং প্রথম সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছিলেন— আর, এন, কেলকার।

প্রসঙ্গক্রমে আরও উল্লেখযোগ্য যে শ্রমিকেরা জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নেতা ব্যাপটিস্টাকে তাদের বিষয়টি নিয়ে সরকার ও কোম্পানীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

রেলওয়ে শ্রমিকদের এই ধর্মঘটে কামগড় হিতবর্দ্ধক সভা সক্রিয় ছিল।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জি, আই, পি রেলওয়ের কারখানার শ্রমিকেরা পুনরায় ও তৃতীয়বার ধর্মঘটের পথে নামেন। এই ধর্মঘট ৩৫ দিন চলেছিল। সেই সময়ে কারখানার সাহেব ফোরম্যানদের কি দাপট ছিল এই ধর্মঘটের একটি ঘটনা থেকে তা বোঝা যায়। এক সাহেব ফোরম্যান তখন তার নিজস্ব রিভলবার দিয়ে শ্রমিকদের উপর দুরাউণ্ড গুলি ছুঁড়েছিলো। আর কোম্পানী ধর্মঘট আন্দোলনের নেতাদের দূর-দূরান্তে বদলী করে দিয়ে ধর্মঘটীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বম্বে বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বের পোষ্টাল শ্রমিকের আঠার দিনব্যাপী ধর্মঘট শ্রমিক আন্দোলনের এক জঙ্গী চেতনার অভূতপূর্ব বিকাশ। যুদ্ধ চলাকালে সরকারী কর্মচারীদের, বিশেষ করে, ডাক বিভাগের কর্মীদের ধর্মঘট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের রক্ত চক্ষুর বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সংগ্রামী জবাব।

এই সব ধর্মঘট যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তখন বিভিন্ন প্রদেশে ট্রেড ইউনিয়নও গড়ে উঠছিল। ১৯১৮ সালে মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন, আমেদাবাদ উইভার্স ইউনিয়ন, থ্রসল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, কার্ডরুম অ্যাণ্ড ফ্রেম

ডিপার্টমেণ্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং ড্রাইভার্স অয়েলম্যানস অ্যাণ্ড ফায়ারম্যানস ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেদাবাদের ক্রাফট ইউনিয়নগুলি গড়ে তুলেছিলেন বস্ত্রশিল্পের এক রাঘববোয়ালের কন্যা শ্রীমতি অনুসূয়া বেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল আমেদাবাদের বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকদের শিল্পভিত্তিক ধর্ম্মঘট। এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণী মালিক শ্রেণীর হাত থেকে মজুরী বৃদ্ধির দাবি আদায় করে নিতে পেরেছিলেন। ১৯১৮—২০ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত আমেদাবাদের শ্রমিকেরা এক ক্লান্তিহীন ধর্মঘট পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোন শিল্পভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠেনি।

আমেদাবাদের শ্রমিকদের মধ্যে যে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল, তা ছিল সম্পূর্ণ এক নতুন দৃষ্টি ভঙ্গীর।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ধর্মঘট এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ার সূচনা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধর্ম্মঘটের ঢেউ দেখা গিয়েছিল।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা পৌরসভায় ধর্ম্মঘট, বোম্বে বস্ত্র শিল্পে ধর্ম্মঘট, আমেদাবাদে বস্ত্র শিল্পের ধর্ম্মঘট, বাংলাদেশের খড়্গপুর রেলওয়ে কারখানায় ধর্ম্মঘট, মাদ্রাজ ট্রামওয়ে ধর্ম্মঘট, লক্ষ্ণৌর রেলওয়ে কারখানার শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট ও মাদ্রাজের বস্ত্র শিল্পের ধর্ম্মঘট উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি শ্রমিক ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ঘটনাটি ঘটেছিল রেঙ্গুনে। তখন রেঙ্গুন ভারতের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুন বন্দরের কুলিরা ধর্মঘট করে এবং মেজিস্ট্রেট উক্ত ধর্মঘটকে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে ঘোষণা করেন। আর শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করে, আইনের যুপকাষ্ঠে হাজির করে কঠিন সাজা দেওয়া হয়।

এই সব কুলিরা অধিকাংশই ছিল ভারতীয়।

এই কুলি ধর্মঘটে রেঙ্গুন সোশাল সার্ভিস লীগ সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল, তার ফলে এই লীগের চারজন সক্রিয় সদস্য এ, আর, ভূমালী, এ, জি, মেহতা, এস, পি, মাত্তি, এম, কে, রাওকে কোর্ট থেকে কঠিন সাজা দেওয়া হয়।

এই সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের আইনগত সাহায্য করার জন্য বাংলা দেশ থেকে ছুটে গিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে খড়্গপুর রেলওয়ে শ্রমিকদের ধর্মঘটের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যুক্ত ছিলেন।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে আর একটি বিশেষ ঘটনা হ'ল ভারতীয় পুঁজির পীঠস্থান আমেদাবাদের বস্ত্র শিল্পের শ্রমিক আন্দোলনে গান্ধীজীর আবির্ভাব।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে এক নতুন দর্শন নিয়ে গান্ধীজী শ্রমিক আন্দোলনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রকৃত পক্ষে বলা চলে, গান্ধীজীই প্রথম ভারতের শ্রমিক আন্দোলন এক নতুন রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে তোলেন।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিক আন্দোলনের উপর ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের হিংস্র থাবা পড়ল।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদুরায় এক জনসভায় আপত্তিকর বক্তৃতা দেবার জন্য ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের ১২৪এ ধারা অনুযায়ী বরদারাজুলা (Varadarajula) নাইডুর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয় এবং তাঁকে জেলে পোরা হয়।

শ্রীবরদারাজুলা নাইডু মাদুরায় শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

নাইডু হাইকোর্ট থেকে জামীনে মুক্তি পেলেও, তাঁর বিরুদ্ধে এক শর্ত আরোপ করে দেওয়া হয়, তাতে বলা হয়েছে যে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত সাপেক্ষে তিনি কোন বিবৃতি দিতে পারবেন না ও প্রচার কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না।

ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশ কালে ব্রিটীশ আইনের এক চরম আঘাত এল। কিন্তু ধর্মঘট আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন গড়াতে এই ধরণের সাজা, কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে পারেনি।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটিকে ভারতের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে ইতিহাসবিদেরা স্থান দিয়েছেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, মাদ্রাজ লেবার ইউ-নিয়ন-এর আগে ভারতে আরও ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতাতে কয়েকটি ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল। এই ইউনিয়নগুলি বস্ত্রশিল্পে, রেলওয়ে, ট্রাম, ও জাহাজী শ্রমিকদের মধ্যে আর সরকারী ও বে-সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল।

১৯১৭ ও ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মঘটের ঢেউ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দেখা দিয়েছিল, আর ১৯১৯ ও ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে তা' উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করে। এবং এই সময়ে ইউনিয়ন গড়ার এক বিরাট সাড়া পড়ে যায়।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সাতটি নতুন ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল, যার মধ্যে মাদ্রাজে ৪টি, বোম্বেতে ২টি এবং কলকাতায় একটি।

এই ইউনিয়নগুলির মধ্যে মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন, কলকাতার ইণ্ডিয়ান সিম্যান ইউনিয়ন ও বোম্বের ক্লার্কস ইউনিয়ন সমধিক পরিচিত।

১৯১৯—১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিক ধর্মঘট ভারতব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বের বস্ত্রশিল্পের দেড় লক্ষ শ্রমিকের শিল্পব্যাপী ধর্মঘট এক ঐতিহাসিক ঘটনা। আর এই সময়ে মাদ্রাজ ট্রামওয়ে শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক ও জনসাধারণের মৈত্রীর দিক থেকে এই ঘটনাও কম তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের বোম্বের বস্ত্রশিল্পের ১১ দিনের ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা মজুরী বৃদ্ধির দাবী আদায় করে নিতে পেরেছিলেন এবং এই সময়ে

রেলওয়ে কারখানা, টাকশাল, বন্দর ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেছিলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বেতে একটি ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদেশব্যাপী ৭৫টি মিল থেকে এই সম্মেলনে প্রতিনিধিরা মিলিত হয়েছিলেন। এই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রদেশব্যাপী একই দাবীর ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলা।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বের ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে একটি দাবীপত্র গৃহীত হয়। এই দাবীপত্রে কাজের ঘণ্টা কমানো; বিরতির সময় বৃদ্ধি; প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড প্রবর্তন ও শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করার দাবী করা হয়। এই সম্মেলন থেকে শ্রমিকদের নিম্নতম বেতন নির্দ্ধারণের জন্য একটি কমিশন নিয়োগের দাবি করে বম্বে সরকারের নিকট পাঠানো হয়।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বাঙলাদেশে লিলুয়া রেলওয়ে কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট, চটকল শ্রমিকদের এবং গোরক্ষপুরে রেলওয়ে গার্ডস্ ও ড্রাইভারদের ধর্মঘট, প্রভৃতি সংগঠিত হয়েছিল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আরও দশটি ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। যার মধ্যে বোম্বেতে পাঁচটি, মাদ্রাজে দুটি ও বাঙলা, উত্তরপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে একটি করে ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল।

এই ইউনিয়নগুলির মধ্যে কলকাতার এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন, মাদ্রাজের এম এণ্ড এস, এম, রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন আর বোম্বের সি-ম্যানস্ ইউনিয়ন বিখ্যাত।

এই সময়ে শ্রমিকশ্রেণী শুধু তার অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার মধ্যে আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখেনি, রাজনৈতিক আন্দোলন যেমন করেছেন, তেমনি ব্যবস্থাপক সভায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন।

১৯১৯ খৃঃ রিফর্ম এ্যাক্টে প্রদেশ ও কেন্দ্রে শ্রমিক প্রতিনিধি পাঠাবার ধারা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এটি ছিল এক হাস্যকর ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৪০ জন প্রতিনিধির মধ্যে শ্রমিকদের জন্য মাত্র একটি

আসন ও মালিকদের জন্য ২০টি আসন নির্দিষ্ট ছিল। আর প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় জমিদার, ব্যবসা ও বাণিজ্যের ও শিল্পপতিদের, বাগিচা ও খনি শিল্প এবং ইউরোপিয়ন বংশোদ্ভূতদের জন্য ৮৫টি আসন ছিল নির্দিষ্ট। শ্রমিক প্রতিনিধিদের যে ব্যবস্থাটুকু ছিল, তাও তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যেতে পারতেন না। সরকার মনোনীত প্রার্থীদের জন্য তা' ছিল নির্দিষ্ট।

এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রথমে আপত্তি তোলেন মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন। কিন্তু ১৯১৯ খৃঃ ব্যবস্থাপক সভাব জাহাজী শ্রমিকদের নেতা মহঃ ডি, এম, দাউদ যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, ইতিপূর্বে আর কেউ তা' করেনি। তাঁর এ কাজ ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে অগ্রণী ভূমিকা হিসাবে স্বীকৃতি হয়ে থাকবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার মঃ দাউদ ছিলেন সরকারের মনোনীত একজন শ্রমিক প্রতিনিধি। তিনি প্রস্তাব রাখেন যে,—

"এই পরিষদ সরকারের কাছে সুপারিশ জানাচ্ছে যে, বঙ্গীয় নির্বাচন বিধিকে এমন ভাবে সংশোধন করা হোক যাতে শ্রমিক শ্রেণী নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করার জন্য ভোটাধিকার পায়, তাদের জন্য অন্তত ৮টি আসন যেন নির্দিষ্ট করা হয় এবং বিশেষ শ্রমিক নির্বাচক মণ্ডলীর মাধ্যমে যাতে তারা প্রতিনিধি পাঠাতে সক্ষম হয়।"

সেদিন মহম্মদ দাউদের প্রস্তাব গৃহীত না হলেও ১৯২৫ সালে তা সংশোধিত রূপে গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাবে ৩নং ধারা সংশোধন করা এবং শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলী গঠনের কথা বলা হয়েছিল।

১৯১৯ খৃঃ শ্রমিক শ্রেণী বিরাট বিরাট ধর্মঘট করেছিলেন, যে সময়ে ভারতরক্ষা আইন বলবত ছিল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা পাঞ্জাবে জালিয়ানাবাগের মত হত্যাকাণ্ড করেছিল। আইন অথবা বর্ব্বর সংগ্রাম কোনটি দিয়েই শ্রমিক শ্রেণীকে প্রতিহত করা যায়নি। বরং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে রাজনৈতিক ধর্মঘট করে শ্রমিক শ্রেণী আবার ঐতিহাসিক বিকাশের পথে পা ফেললেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বের রাজপথে শ্রমিক শ্রেণী রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে—যাত্রারম্ভ করেছিলেন, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী কল-কারখানায় ধর্মঘট করে শ্রমিক শ্রেণী আরব সাগরের কূলের সে রাজনৈতিক ঢেউ বম্বে থেকে ভারতের প্রান্তরে প্রান্তরে নতুন নতুন উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল।

এই ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে জাতীয় সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী তার নিজস্ব ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ধর্মঘট আন্দোলন, অতীতের সমস্ত রেকর্ড'কে ভঙ্গ করে শ্রমিক শ্রেণী এক নতুন নজির স্থাপন করে। এই সময়ে কয়েকশত ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় এবং এমন কোন শিল্প বাকী ছিল না যেখানে ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়নি।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম টাটা ষ্টীল কারখানার ৩০,০০০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করেন। আর শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। জামসেদপুর লেবার এসোশিয়েশনের প্রথম সভাপতি ছিলেন কলকাতার জনৈক ব্যারিষ্টার এস, এন, হালদার। এই বছরেই বাগিচা শিল্পে, কয়লাখনিতে ধর্মঘটের উদ্বোধন হয় ও বোম্বের শিল্প ভিত্তিতে সূতা বল শ্রমিকদের ধর্মঘট একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

১৯২০ খৃঃ ভারত সরকারের প্রেসে ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়, যার ফলে কলকাতা, দিল্লী ও সিমলার প্রেসের কাজ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আর এই বছরে পোষ্টম্যানদের ধর্মঘট, ভারত সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতিকে আঘাত করেছিল।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম বাংলার চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট একটি বৈশিষ্টপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আর এই বছরই কলকাতার ট্রামওয়ে শ্রমিকদের ধর্মঘট নতুন ইতিহাস নিয়ে যাত্রা করল।

১৯২০ সালের এইসব ধর্মঘটের সঙ্গে পাঞ্জাবের নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে

শ্রমিকদের ধর্মঘট ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন পর্য্যায় শুরু করল।*

(গ) ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার আন্দোলন

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে শ্রমিক শ্রেণী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ার যুগে প্রবেশ করে। আমেদাবাদে শ্রমিকদের মধ্যে ক্র্যাফট ভিত্তিতে শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠলেও, সব শিল্প ভিত্তিতে মাদ্রাজে ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল। এই ইউনিয়নগুলি নিছক কাগজে সংগঠন ছিল না, আমেদাবাদে ক্র্যাফট ইউনিয়ন ধর্মঘটও পরিচালনা করেছিল এবং বহুকাল এই ইউনিয়ন জীবিত ছিল। এমন কি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদে 'মজদুর মহাজন' প্রতিষ্ঠা হবার পরও অবশ্য ক্র্যাফট ইউনিয়ন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের চূড়ান্ত বিকাশ নয়। বরং একই শিল্পে অন্যান্য শ্রমিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে একটি গ্রুপ হিসেবে ক্র্যাফট ইউনিয়নগুলি লড়াই করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন যুগের শুরু।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা এই যুগের শ্রেষ্ঠ প্রয়াস। ইতিহাসে মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়নকে ভারতের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু এই মর্যাদা পাবার অধিকার উক্ত ইউনিয়নের নেই। এর পূর্বেও অনেক ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল, আমরা আগের অধ্যায়ে তা' দেখেছি। কিন্তু পূর্বের ইউনিয়নের তুলনায় মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়নে আধুনিক ট্রেড ইউনিয়নের ছাপটি ছিল উজ্জ্বলতর। যে কোন শিল্পের শ্রমিক এই ইউনিয়নে চাঁদা দিয়ে সভ্য হ'তে পারত।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল বি, পি, ওয়াদিয়া-কে সভাপতি করে মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হয়। এই ইউনিয়নটির প্রতিষ্ঠার সমগ্র কৃতিত্ব একমাত্র ওয়াদিয়ার ছিল না। মাদ্রাজের সিঙ্গারা ভেলু চেটটিয়ার

---

* ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯২০ খৃষ্টাব্দটি একটি ঐতিহাসিক বছর—ধর্মঘটের দিক থেকে। ধর্মঘটের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 'ভারতের ধর্মঘট আন্দোলনের কালপঞ্জী' গ্রন্থে দেওয়া হবে।

ও জি, রামমুজুলা নাইডু এই দু'জন সমাজবাদী ওয়াদিয়াকে মাদ্রাজের বিনী কর্ণাটিক মিলস্ শ্রমিকদের এক সভায় নিয়ে আসেন এবং বিভিন্ন শ্রমিকদের টিফিনের সময় সভা করে অবশেষে উক্ত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। সিঙ্গারা-ভেলু চেটটিয়ার এই যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে প্রবেশ করলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি থাকাকালীন কয়েক বছর আগে তিনি মারা যান।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মঘট আন্দোলনের গতি তুঙ্গে এসে পৌছে। প্রথম দু'মাসে সরকারী রেকর্ডে দু'শতাধিক ধর্মঘটের কথা লিপিবদ্ধ আছে এবং ১৫ লক্ষের মত শ্রমিক এই ধর্মঘট আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এবং ধর্মঘটগুলো পূর্বতন ধর্মঘটের চেয়ে অনেক বেশী তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী ছিল। আর শ্রমিক শ্রেণী অনিচ্ছুক শক্তির হাত থেকে শুধু মজুরী বৃদ্ধি করে নেননি, এমন কি কাজের ঘণ্টাও কমিয়ে নিতে পেরেছিলেন।

এই সময়ের ধর্মঘট শুধু স্বতস্ফূর্ত শ্রমিক বিক্ষোভের পর্যায়ে পড়ে না, বরং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

১৯১৮ ও ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে ফেডারেশন গড়ে উঠেছিল।

এইসব ফেডারেশনের মধ্যে বোম্বে পোষ্টাল এণ্ড রেলওয়ে মেল সার্ভিস এসোসিয়েশন, বোম্বে পোষ্ট ম্যান এণ্ড লোয়ার গ্রেড ষ্টাফ ইউনিয়নে যথাক্রমে ১৫টি ইউনিয়ন ও ১২টি ইউনিয়ন অন্তর্ভূক্ত ছিল। ৩

১৯২০ সালে ভারতের প্রতিটি প্রদেশে এবং বিভিন্ন শিল্পেই ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। একমাত্র চটকলে ও খনিতে কোন ইউনিয়ন গড়ে ওঠে নি।

সে সময়ে ইউনিয়ন গড়ার সবচেয়ে উৎসাহজনক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল সরকারী কর্মচারীদের।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সারা ভারতে পোষ্টাল ও আর, এম, এস, ইউনিয়নের ২৩০টি ব্রাঞ্চ ছিল, যার সভ্য সংখ্যা ২৯,১২১ জন ছিল।

---

3. Report of the I. L. O

সে সময়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের একটি হিসেব থেকে দেখা যায় যে, ভারতে বিভিন্ন ইউনিয়নে ৫০০,০০০ শ্রমিক সদস্যভুক্ত। ফলে, পৃথিবীর পনরটি দেশের মধ্যে ভারত স্থান দখল করে নিয়েছিল। যদিও অনেকে এই হিসেবটি অতিরঞ্জিত বলে থাকেন।

কিন্তু এই সময়ে ভারতে কমপক্ষে ১২৫টি ইউনিয়ন ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ থাকতে পারে না।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, জামসেদপুর লেবার ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা। কলকাতার ব্যারিষ্টার এস, এম, হালদার এই ইউনিয়নটি গড়ার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

"১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে জুন অবধি সাধারণভাবে ভারতে শ্রমিকরা ছিলেন অসংগঠিত। কয়েকটা ইউনিয়ন ছিল বটে তবে শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠিত হবার জন্য গণ-আলোড়ন ছিল না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে ধর্মঘট দেখিয়ে দেয় যে, সংগঠিত প্রয়াস যে তাদের অবস্থাকে উন্নত করতে পারে তা দেখতে না-পাবার মত অজ্ঞতা বা অক্ষমতা এই সংগঠনহীনতার হেতু নয়। শ্রমিকরা সংগঠনের জন্য তৈরী ছিলেন কিন্তু তাদের মধ্যে সংগঠনের ধ্যানধারনা জোরালোভাবে প্রচার করা হয় নি এবং তাদের কাছে দৃষ্টান্তও ছিল না। অতীতে তাদের ধর্মঘট, যেমন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বের মিল শ্রমিক ধর্মঘট কাযত কোনও সংগঠন ছাড়াই হয়েছিল। আর তাদের স্থিরমতিত্ব, বেরাদারি এবং নিজেদের ধর্মঘটের ন্যায্যতা সম্বন্ধে ধারণা উচ্চমাত্রায় ছিল বলেই এত দুর্ভোগ সত্বেও ধর্মঘটগুলি এত দিন ধরে বিনা সংগঠনেও চলতে পেরেছিল। নিশ্চতভাবেই ভারতব্যাপী আন্দোলন হবার সময় এসে গিয়েছিল এবং একটি সামান্য ঘটনা সেই সুযোগ নিয়েও এল।"[৪]

আর ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বোম্বেতে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নতুন যুগের উদ্বোধন হ'ল।

---

4. Report of the First session of the A. I. T, U. C.—1920

নবম অধ্যায়

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম

ক। গোড়ার কথা

১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে, রুশ দেশে বিশ্বের প্রথম শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতা পায়। রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর এই সাফল্যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়। শোষণ ও সামাজিক অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলন নতুনভাবে উৎসাহী হয়ে আরও তীব্র আকারে আত্মপ্রকাশ করে। রুশ বিপ্লবের ফলাফলের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আত্ম-প্রত্যয়ও জন্মালো ও পরবর্তীকালে বিভিন্নদেশে ধর্মঘটের জোয়ার দেখা দিল। তার কয়েক বছর পর 'লীগ অব নেশনের' উদ্যোগে আই, এল, ও প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ গড়ার জন্যেই মালিকপক্ষ ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের মিলিত বৈঠক অনুষ্ঠান করা, এই লক্ষ্য নিয়ে আই, এল, ও গঠিত হয়েছিল।

পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া শ্রমিক আন্দোলন যাতে শ্রেণী সংগ্রামে রূপান্তরিত না হতে পারে, সেই দিকে নজর ছিল আই, এল, ও প্রতিষ্ঠাতাদের।

আই, এল, ও'র সম্মেলনে ভারতের শ্রমিক প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা ভারত সরকার ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে কোন আলোচনা না

করেই এন, এম, জোশী'কে প্রতিনিধি মনোনীত করে এবং বি, পি, ওয়াদিয়াকে তাঁর উপদেষ্টা নির্দিষ্ট করে। লীগ অব নেশনে'র যে ঘোষণাপত্রে আই, এল, ও-র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হয় তার ৩৮৯ ও ৪১২ সংখ্যক ধারায় বলা হয় যে, দেশের সরকার সবচেয়ে প্রতিনিধি স্থানীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। কিন্তু ভারত সরকার সে পথে যায় নি। ভারত সরকারের এই নীতিবহির্ভূত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা প্রতিবাদ জানাতে থাকে।

মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়নের সহঃসভাপতি শ্রীঅরুন্ধ তাঁর কার্যনির্বাহক সমিতির পক্ষ থেকে প্রধান মন্ত্রীর কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়ে বলেন যে, ভারতের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ না করে আই, এল, ও'তে প্রতিনিধি ঠিক করে সরকার আই, এল, ও'র সম্মেলনের প্রস্তাবের (খসড়া) অবমাননা করায় মাদ্রাজের শ্রমিক ইউনিয়ন সরকারের কাছে তাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।[১] উক্ত প্রস্তাবের একটি নকল ভাইসরয়কে দেওয়া হয়। আই, এল, ও'তে এন, এম, জোশীর যোগদান করার যোগ্যতার প্রশ্ন তুলেই বিতর্ক থেমে রইল না। মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শ্রীঅরুন্ধ ২৬শে আগস্ট ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভাইসরয়ের কাছে এক তারবার্তায় প্রস্তাব করেন, মাদ্রাজ (ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা দশ হাজার) লেবার ইউনিয়নের সভাপতি বি, পি, ওয়াদিয়া এখন ইংলণ্ডে আছেন এবং যিনি ভারতের শ্রমিকদের পক্ষ থেকে যুক্ত কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিয়েছেন। শ্রীওয়াদিয়াকে ওয়াশিংটনস্থ আই, এল, ও'র সম্মেলনে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হল।[২] প্রতিবাদ আন্দোলন ঐ ভাবেই থেমে রইল না। সেই সময়ে বোম্বের শ্রমিকশ্রেণী একটি সভা

১। Times of India—1919.

অনুষ্ঠান করে বালগঙ্গাধর তিলক, বি. পি. ওয়াদিয়াকে আই, এল, ও'তে প্রতিনিধিত্ব করে পাঠাবার জন্ম প্রস্তাব গ্রহণ করে।৩ আবার উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে বোম্বেতে আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্যোক্তারা তিলক ও ওয়াদিয়ার প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা নাকচ করেছেন। অজুহাতটি অত্যন্ত বিস্ময়কর। শেষোক্ত সভার প্রস্তাবকারীরা ধর্ম ও শ্রেণী বিদ্বেষ নিয়ে তাঁদের যোগ্যতা নাকচ করেছিলেন। যেহেতু তিলক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোক সুতরাং অ-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের এই সভা প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁদের অচ্ছুৎ করে রাখলেন।

আই, এল, ও'র প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে বিরোধ ও প্রতিবাদ ভারতের মাটিতেই সীমাবদ্ধ রইল না। ব্রিটেনেও তার ধাক্কা লাগে। 'ডেইলি হেরাল্ড' প্রতিবাদে লিখল যে ভাইসরয় শ্রীজোশীকে লীগ অব নেশনের শ্রমিক সেকশনের সম্মেলনে ভারতের শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করেছেন, সেই সম্মেলন আগামী মাসে অনুষ্ঠিত হবে। ভাইসরয় স্বেচ্ছাকৃতভাবে প্রনিনিধি নির্বাচনের আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেছেন।৪ প্রতিবাদের ঝড়ও যেমন ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে বোম্বের চারটি ও মাদ্রাজের পাঁচটি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ওয়াদিয়ার নামও প্রস্তাবিত হয়।

বোম্বের শ্রমিকদের সভায় তিলকের নাম প্রস্তাবিত হওয়ায় 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকা ক্ষেপে গিয়ে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখলেন : ওয়াশিংটনে আই, এল, ও সম্মেলনে তিলক ও বি, পি, ওয়াদিয়াকে প্রতিনিধি হিসেবে বোম্বাইয়ের মিলের শ্রমিক নির্বাচিত

২। Times of India—1919,

৩। Amrita Bazar Patrika—1919

৪। ঐ

করার যে সভা এই সপ্তাহের গোড়ায় করে তা সবিশেষে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এক্ষেত্রে তিলকের কোন যোগ্যতা নেই এবং সম্মেলন সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা নেই, কিন্তু সভার সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণের ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।[৫] ব্রিটিশ খয়ের-খাঁ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরোধী পত্রিকা 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'র এই স্বক্কার জনক ভূমিকা বিশেষ করে, তিলকের বিরুদ্ধে এই প্রবন্ধ আশ্চর্যের কিছুই ছিল না। 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকা তিলক বিদ্বেষী একথা আমাদের জানা আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯০৮ সালে তিলকের গ্রেপ্তার এবং তৎউপলক্ষে 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' সংবাদ পরিবেশনা এই অভিযোগের প্রমাণ করে। কিন্তু তিলক ও ওয়াদিয়ার প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন নিয়ে যে বক্তব্য উক্ত সম্পাদকীয়তে পরিবেশন করা হয়েছে তা' সত্যের অপলাপ মাত্র। বাল গঙ্গাধর তিলক ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শ্রমিক আন্দোলনের সহিত যুক্ত এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সাজার প্রতিবাদে বোম্বের শ্রমিকশ্রেণী যে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটায়, তাতেই প্রমাণ করে যে, তিলক শ্রমিকশ্রেণীর হৃদয় জুড়ে কতখানি অবস্থান করেছিলেন। এবং বি, পি, ওয়াদিয়া তৎকালীন একমাত্র ট্রেডইউনিয়ন নেতা ছিলেন, যাঁর যোগ্যতার প্রশ্ন তোলা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এন, এম, জোশীর সমর্থনে এবং অভিনন্দন জানিয়ে বোম্বেতে কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার মধ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আই, এল, ও'র সভায় বক্তব্য পেশ করবার জন্যে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে বিশেষ বিশেষ দিকগুলো আলোচনার জন্যে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই সভায় সর্বপ্রথম ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর জন্য আট ঘণ্টা কাজের দাবি প্রস্তাবিত হয়েছিল। এবং প্রস্তাবকারীরা

৫। Times of India—1919

আরও দাবি উত্থাপন করেছিলেন যে, আই এল, ও'র সভায় উক্ত সভার প্রস্তাব যেন পেশ করা হয়। আট ঘণ্টা কাজের দাবির বিরোধিতা অনেকেই আবার করেন এবং তাঁদের প্রস্তাব ছিল দশ ঘণ্টা কাজের দিন।

খ। সারা ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন

আই, এল, ও'র প্রতিনিধিত্ব নিয়ে যে বিতর্ক উঠেছিল, তাঁর অবসান ঘটে, এন, এম জোশীর এক বিবৃতির পর।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সংবাদপত্রে এন, এম, জোশীর এক বিবৃতি প্রকাশ করে এক সর্বভারতীয় সভা আহ্বানের প্রস্তাব করেন। একই বিবৃতিতে তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে, ঐ সভা থেকে সর্বভারতীয় সংগঠন গড়া ও আই, এল, ও'র প্রতিনিধি নির্বাচন করা ঠিক হোক।

১৯২০ সালের ১৬ই জুলাই বোম্বের প্যারেলে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের এক সভায় বোম্বাইতে সারাভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এবং এই সম্মেলন থেকে আই, এল, ও'র প্রতিনিধি নির্বাচনে সরকারী মনোভাব-এর নিন্দা করে প্রস্তাব নেওয়া হয়। জোসেফ ব্যাপটিস্টারের সভাপতিত্বে পাঁচশত জন সদস্য নিয়ে এক অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর বোম্বের এম্পায়ার থিয়েটার হলে লালা লাজপৎ রায়ের পৌরোহিত্যে এই প্রথম ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দ এক জায়গায় মিলিত হ'লেন, একটি সারাভারত ট্রেডইউনিয়ন সংস্থা গড়ে তোলার জন্যে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে ব্যাপটিস্টা ট্রেড ইউ-নিয়নের লক্ষ্য কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, বোম্বেতে সাধারণত যা হয়, তা হল ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে সংগঠন করা হয়ে থাকে; সংগঠন আগে করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন পুঁজিপতিরা

ধর্মঘটকে এক শক্তি পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে দেখে, যেখানে তারা দালাল ও পুলিসের সাহায্য নিয়ে থাকে।

প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে সারাভারত থেকে ১০১ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মহাসম্মেলনে ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রতিনিধি কত ছিল তা নিয়ে দেওয়া হল :

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস—১৯২০

১। প্রথম সম্মেলনে প্রদেশ ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা ঃ

		অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন ও সহযোগী ইউনিয়ন সংখ্যা	অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন সংখ্যা	অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের সভ্য সংখ্যা
১)	বোম্বে	৫৬	৪৪	৪৬৮৮১
২)	বাঙলা	৫	১	২৫০৫
৩)	উত্তর প্রদেশ	৮	৩	১৫,৮০০
৪)	সেণ্ট্রাল প্রভিন্স	৬	২	১২৮
৫)	সিন্ধু	২	১	১২৮
৬)	মাদ্রাজ	১৬	৮	৩৫৫৯
৭)	বিহার	১	—	—
৮)	পাঞ্জাব	৯	৪	[illegible]০,২৫৩
৯)	দিল্লী	২	—	—
১০)	ইণ্ডিয়ান ষ্টেট	১ (ভূপাল)	১	১৬০০
১১)	সিংহল	১	—	—
	মোট	১০৭	৬৭	১[illegible]০,৮৫৪

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলনে

২। শিল্প ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা :

১)	রেলওয়ে	২১	১১	৯১৪২৭
২)	বস্ত্র	১২	৯	৭৭১৯
৩)	শিল্পি	৪	৩	১৯,৮০০
৪)	ট্রান্সপোর্ট	৪	২	২৪৭০
৫)	কেরানী	৭	৬	৮৫৬
৬)	ইঞ্জিনীয়ারিং	৮	[illegible]	৭৫৯০
৭)	পোস্ট ও টেলিগ্রাফ	১৫	৫	১৬৮৫
৮)	প্রেস ও সংবাদপত্র	৭	৩	১৮৪৪
৯)	বিবিধ	২৯	১৮	৭৪৬৩
	মোট	১০৭	৬৪	১৪০,৮৫৪

সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে লালা লাজপৎ রায় ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর আশা ও আকাঙ্ক্ষাকেই প্রতিফলিত করেন। তিনি বলেন : আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যে জগতের কথা আগে কারো যেমন জানা ছিল না বা কেউ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই আজ যে সমস্যার মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে সেই সমস্যা আমাদের অতি নিকট পূর্বপুরুষদের চেয়ে অনেক ভিন্ন। আমরা স্বীকার করি বা না করি, আজ এই সত্য উপলব্ধি করতেই হবে।

এই মহান জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা বলে দাবিদার অন্য একটি সত্যের প্রতি কদাচিৎ দৃষ্টি দিয়ে থাকেন ; তা হ'ল, আমরা এমন যুগে বাস করি, যেখানে একটি জাতি অন্যকে বাদ দিয়ে বাঁচতে পারে না। আমাদের দেশের বাইরে যা কিছুই ঘটুক না কেন, তা আমাদের প্রাত্যহিকের উপর যেমন ছাপ ফেলে তেমনি আমাদের জীবনের

সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর প্রভাবের ফলে আজ খাদ্য মাংগা, কাপড় মাংগা, আমাদের যা কিছু আছে তার উপর কম বেশি এর উত্তাপ। তেমনি আমাদের দেশে যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, তার প্রভাবও আমাদের দেশের বাইরের জগতের উপর ঘনিষ্ঠভাবে পড়ে। এই প্রভাব জীবনের কোন সীমিত কেন্দ্রের উপরই শুধু পড়ে না, তা পড়ে জীবনের সর্বস্তরে, বিশেষ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে।

আমাদের পছন্দ হোক, বা না হোক, আমরা প্রত্যেকে আধুনিক জগতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এই আধুনিক জগৎ বলতে বোঝায়, ব্যাপক উৎপাদন, সংগঠিত মূলধন, সুসংবদ্ধ শিল্প এবং সংগঠিত শ্রমিক। ব্যাপক উৎপাদন সংগঠিত শ্রমিককে সৃষ্টি করে। ব্যাপক উৎপাদনের মধ্য দিয়ে মূলধনের সংগঠনের সৃষ্টি যেমন তেমনি যা কোন দিন দেখা যায়নি এমন জিনিস দেখা দেয়। সংগঠিত মূলধনের নিজস্ব গতি আছে। গত ১৫০ বছর ধরে সে পৃথিবীর উপর শাসন চালিয়েছে এবং আজকের দিনে সে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। সে পুরানো সভ্যতাকে চুরমার করে দিয়েছে, ধর্ম, বিজ্ঞানকে শৃঙ্খলিত করেছে, অর্থাৎ প্রকৃতির যা কিছু সম্পদ ও মানুষের বোধ তাকে সে বেঁধে ফেলেছে। মানুষ তার দাস হয়ে গেছে। পুরানো চীনের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কোটি পরিশ্রমী, শিল্পরসিক মানুষের প্রাচীন সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও শিল্পের চাকা ভেঙে দিয়ে সে ছুড়ে দিয়েছে তাকে নেকড়ের দিকে। তেমনি প্রাচীন সংস্কৃতি, ধর্মের ঐশ্বর্য, মহান দর্শন, শিল্পের সৌকুমার্য নিয়ে ভারতের যে সমাজ যা পৃথিবীর পরিবারের এক পঞ্চমাংশ, সে-ও আজ সংগঠিত মূলধনের দাপটে ক্ষত বিক্ষত এবং আজ সে তার পায়ের নিচে পড়ে আছে। সমরতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ হল ধনতন্ত্রের যমজ সন্তান, তারা তিন জনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন এক কিন্তু তিন জনে একজন। তাদের

ছায়া, ফল, চিৎকার—সব বিষাক্ত। দেখিতে হলেও এর প্রতিশোধক আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং তা হল সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী।

আমরা ভারতে অনেক দেরিতে খুঁজে পেয়েছি এই প্রতিশোধক এবং তার ব্যবহার করছি এর কারণ অবশ্য আছে। আমরা রাজনৈতিকভাবে নিবীর্য ও আর্থিকক্ষেত্রে অসহায়। আমাদের রাজনৈতিক নির্বীর্যতা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের গড়ে তুলেছে পরবাসী জাতি, আমাদের মনিবরা নিজেদের স্বার্থে ও গৌরবের ঢক্কা নিনাদের জন্য আমাদের ব্যবহার করেছে তাদের পৃথিবী জয় করার কাজে ও শাসন করার জন্যে। তারা আমাদের ব্যবহার করেছে তাদের কলোনি বাড়িয়ে নেবার কাজে বা তাদের জমি চাষ, খনি চালাবার এবং শিল্পে কাজ করার জন্যে এবং তাদের সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। এর উপর তারা আমাদের অপমান করে ক্ষতকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে; তারা আমাদের ধর্মকে ছোট করেছে, আমাদের সংস্কৃতিকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করেছে, এবং বিশ্বের ক্ষেত্রে আমাদের এমনভাবে পরিচয় দিয়েছে যাতে তথাকথিত সভ্য সমাজে মানুষ হিসেবে আমরা একই পর্যায়ে সমানে-সমান পংক্তিভুক্ত হতে না পারি।

তাদের চোখে আমরা হলাম কুলির জাত, পশুর চেয়ে মানুষের যে সব গুণের জন্য তফাৎ তেমনি তফাৎ যেন। এই কূটচাল করে সংগঠিত ব্রিটিশ পুঁজি ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার শাদা শ্রমিকদের মনে আমাদের সম্পর্কে একটা হীন ধারণা সৃষ্টি করতে পেরেছে। তাদের কুকর্মের জন্য এই কূটচালের প্রয়োজন কারণ ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিক বা এশিয়ার শ্রমিকদের ভ্রাতৃত্ব তাদের পশুশক্তিকে চুরমার করে দিত এবং তাদের শোষণকে পর্যুদস্ত করত। ম্যাঞ্চেস্টারের শ্রমিকদের ভয় দেখানো হয় যে, ভারতের শ্রমশক্তি অনেক

শস্তা। আর মাঞ্চেষ্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কথা বলে ভারতে আমাদের সব সময়ে ভয়ের মধ্যে রাখা হয়। যা হোক, যুদ্ধের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকরা অবশেষে এই সত্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন যে, তাদের মুক্তি সম্ভব না যদি না এশিয়ার শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হন বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে জোটবদ্ধ হন। ইউরোপের শ্রমিকরা আজ তাদের মনিব ও মালিকদের ভয় পাইয়ে দিয়েছেন এবং উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, তাদের আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করছে ইউরোপ ও এশিয়ার শ্রমিকদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মধ্যে। যতক্ষণ পর্যন্ত চীন ও ভারতে সস্তা মজুর বর্তমান, যতক্ষণ ভারত বৈদেশিক মূলধন প্রবেশে বাধাদানে অসহায়, এবং যতক্ষণ ইউরোপীয় শ্রমিকদের স্বার্থের বিপক্ষে বৈদেশিক পুঁজি ভারত ও চীনের সস্তা শ্রম ব্যবহারে সক্ষম ততক্ষণ, ইউরোপের সর্বহারারা (প্রোলেটারিয়েট) যেমন নিরাপদ-বোধ করবেন না তেমনি তাদের নিরাপত্তাও নেই। আজ যে আন্দোলনের উদ্বোধন আমরা করছি তা জাতীয় গুরুত্বের চেয়ে অনেক বেশি ; এর আন্তর্জাতিক গুরুত্ব রয়েছে। ভারতের শ্রমিক আজ শুধু ভারতের শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে না, সে আজ প্রাণমন দিয়ে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। ভবিষ্যৎ কি হবে সে সম্পর্কে এমনি কোন আপ্তবাক্য করা ঠিক হবে না, তবে এটা অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, আমরা যে আন্দোলনের জন্ম দিচ্ছি তা একটি বিশ্বব্যাপক গুরুত্ব পাবে।

এই দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এখনও শৈশবকাল এবং সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সংস্থা গঠনের কাজটা যথেষ্ট পরিণত নয়, তবে আমার মতে, একদিনেই সেই সংগঠন হয়ে ওঠে না।

আমাদের দেশে শ্রমিকদের মালিক দুই দল, সরকার ও ব্যক্তিগত মালিকানা, পুঁজিপতি। এক অর্থে সরকার ও বড় পুঁজিপতি। সাধারণ সওদাগরী সংস্থার চেয়ে রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট, পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাফ এবং অন্যান্য। এই শ্রেণীর মালিকদেরই সারা ভারত জুড়ে পুঁজি। শ্রমিকরা অনেক অংশে এখনো ঠুঁটোজগন্নাথ হয়ে আছে, তাই শ্রমিকদের সারাভারত সংগঠন থাকা উচিত। এবং বিপক্ষ দলের সঙ্গে যুঝবার মত সারা ভারত জুড়ে প্রচার সংগঠন করতে হবে।

* * *

কাজ কাজই, তা কায়িকই হোক বা বুদ্ধির কাজই হোক, বা দক্ষ শ্রমিক ও অদক্ষ শ্রমিকেরই হোক। কিন্তু আর্থিক ক্ষেত্রে একটা বিরাট করে শ্রমিকদের রাখা হয়েছে। ভারত সরকার বা ব্যক্তিগত মালিকানায়, এই অমানবিক, অসমান অবস্থার যে কাঠামো রাখা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সারা ভারতের সংগঠন প্রয়োজন, যেখানে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করবে, আন্দোলনের ক্ষেত্রে বুদ্ধি যোগাবে।

* * *

যদি শ্রমিকরা অর্ধাহারে থাকেন, যদি তাদের বস্ত্রাভাব থাকে, যদি তাঁরা অপরিসরগৃহে বাস করেন বা শিক্ষার অভাব ঘটে তবে ভারতের শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে তাদের কোন উৎসাহ থাকবে না এবং তাদের কাছে স্বদেশপ্রেমের আবেদন কোন সাড়া জাগাবে না। এই ক্ষেত্রে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীকে জাতীয় ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হবে। "বিশ্বভিত্তিক স্তরে মূল ধনের সংগঠন আছে এবং আর্থিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে প্রভূত সাহায্য সে পেয়ে থাকে। এর অস্ত্র, শ্রমিকদের চেয়ে অনেক কম ভঙ্গুর। এবং এর বিপদ ব্যাপক।"

এই সব বিপদের বিরুদ্ধে ভারতের শ্রমিককে বাইরের শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে এবং এই কাজটির প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে, স্বদেশে নিজেদের সংগঠিত করা। এই সম্মেলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, এমন একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে তোলা, যা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করবে।

নিজের শ্রেণী ও স্বার্থ রক্ষা করার জন্য শ্রমিকদের ভোটাধিকার থাকা উচিত, এবং সে তাঁর নিজের স্বার্থানুযায়ী তার শ্রেণীর (শ্রমিক-শ্রেণী) প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করবেন। তাই ইউরোপে প্রতিটি শ্রমিক হলেন রাজনৈতিক সচেতন। এছাড়া ইউরোপের শ্রমিকরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আর একটি অস্ত্র আবিষ্কার করেছেন। তাদের নেতা হিসেবে বেরিয়েছেন, রুশ শ্রমিকরা, যাদের লক্ষ্য: সর্বহারা-শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা। আমরা ভারতে প্রাথমিক স্তরেও পৌঁছাইনি। সরকার এখনো ভোটাধিকার দেয়নি এবং তারা (সরকার) আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে বাধা দেবে। তারা আমাদের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ, বিশ্বের ঘটনার সঙ্গে সংযোগ ইত্যাকার ব্যাপারে মিলিটারী ব্যবহার করে তচনচ করে দিতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করবেন না। লাহোরস্থ রেল ধর্মঘট, বোম্বেতে সরকারী প্রেসধর্মঘট ইত্যাকার ব্যাপারে তারা তাদের কীর্তি দেখিয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়াতে রপ্তানী ও লণ্ডনের ডেইলী হেরাল্ড পত্রিকা নিষিদ্ধ করণের মধ্যে দিয়ে তাদের কাজ কারবার বোঝা গেছে। এবং সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকায় কুৎসা প্রচার, অন্যপক্ষের সোভিয়েত খবর জানতে না দেওয়ার ব্যাপারে ভারত সরকারের নিষেধ ইত্যাকার, ঘটনায় এই চরিত্রআরও উৎসাহিত হয়েছে। ইউরোপে সত্য দুই ধরনের :

(ক) লণ্ডন টাইমস, মর্নিং পোস্ট এবং উইনস্টন চার্চিলের মত মানুষরা পুঁজিপতি ও সরকারী সত্য প্রতিফলিত করে।

(খ) সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ডেইলী হেরাল্ড হল ন্যায়ের মুখপত্র, এরা সমাজতান্ত্রিক ও শ্রমিকধর্মী সত্যের বাহক। ভারত সরকার অন্যপক্ষের কথা জানতে না দিয়ে প্রথমোক্ত সত্যকে আমাদের গলাধঃকরণ করাতে চান। কিন্তু ঐ সত্য আর কোনমতেই সত্য নয়; সত্য হ'ল: একদিকে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ অন্যদিকে সমাজতন্ত্র। এটা হয় ধনতান্ত্রিক, বুর্জোয়াতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক। সামগ্রিক সত্য হল, তিনটি ধরনকে জানা ও সেই অনুসারে সিদ্ধান্ত করা। ইউরোপ ও আমেরিকায় আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাহাকে বলা যায় যে, সমাজতান্ত্রিক, আজকে বলশেভিক-সত্য অনেক বেশি ভাল এবং ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ সত্যের চেয়ে অনেক মানবিক।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্র-পত্রিকা নতুন চাতুরী শুরু করেছে, পাঠকের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে চাইছে: তাহ'ল বলশেভিকবাদ ও গান্ধীবাদ। একে (সোভিয়েত রাশিয়াকে) লোকের সামনে ছোট করা, মিথ্যেভাবে দেখানোর জন্য কোন কিছু শয়তানী বাদ দেয় না। এই কাজ সরকারের নোংরা কাজ দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সরকারের যে কোন কাজ, তা ব্রিটিশ পত্রিকা জাস্টিস ও ডেইলী হেরাল্ডের বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থাই হোক না কেন, তা হ'ল সবক্ষেত্রে একতরফা রায়, অন্যায় ও উস্কানিমূলক। ভারতের জনসাধারণ শিশু নন, যে, যারা এই ধরনের (ব্রিটেনের লেবার দলের প্রচার) খোরাক থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন না। বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর ও কলকাতার কয়েকটি ধর্মঘটের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছে যে, গ্রেটব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র,

ফ্রান্স ও ফ্রান্সের শ্রমিকদের চেয়ে তারা যে অনেক বেশি ডিসিপ্লিন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

* * * *

ভারতে এমন কেউ নেই যিনি বিশ্বাস করেন যে, ইউরোপ ও রুশ শ্রমিকরা যে পদ্ধতি (আন্দোলনের—লেখক) গ্রহণ করেছেন সেই পদ্ধতিই ভারতে প্রয়োগ করা যায়। এই মতের কেউ যদি থাকেন, তাদের বেলাকুনের কাছে লেনিনের বাণীটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। যেখানে তিনি (**লেনিন**—লেখক) হাঙ্গেরীতে প্রয়োগ করা অপরিপক্কতার কাজ হবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছিলেন। বর্তমানে আমাদের যা প্রয়োজন তাহ'ল সংগঠন করা, শিক্ষা ও বিক্ষোভ সংগঠিত করা। আমাদের শ্রমিক সাধারণকে এমনভাবে শিক্ষিত ও সংগঠিত করে তুলতে হবে যাতে তারা শ্রেণী সচেতন হয়ে ওঠেন। আমি ক্রম পর্যায়ে স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি বাস্তব জীবনকে অস্বীকার বা তা থেকে চোখ বুজে থাকতে রাজী নই।

একজন মানুষের হাতে লৌহ বলয়, ও তিনি শৃঙ্খলিত। সেই মানুষ হাতে লৌহবলয় ভেঙে ফেলতে পারেন তবু এখনও তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত নন। এদেশের শ্রমিকদের অনেক বন্ধন আছে যা তাদের ছিঁড়তে হবে। এটি করতে সময়ের যেমন প্রয়োজন তেমন প্রয়োজন শক্তির; এবং তার শ্রমিকের সেই সংগঠন, নিয়মানুবর্তিতা। তাঁরা মুক্ত কিছুতে হবেন না যদি না তারা সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে দূরে ফেলে দেন।

* * * *

শ্রমিকদের কোন ফাঁদে পড়া উচিত হবে না। এমন দিন আসতে পারে যে, বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে সাহায্য ও পরিচালনা করার মত মানুষ তাদের কাছে আসবে কিন্তু তাদের (শ্রমিকদের) লক্ষ্য গুলিয়ে

দেবার জন্য। "তাই শ্রমিকশ্রেণীকে তার নিজের শ্রেণী থেকেই নেতা খুঁজে বের করতে হবে।"

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে প্রথম সম্মেলনে চা বাগিচা, চট ও খনিশিল্পের কোন শ্রমিক প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন নি। অথচ এই তিনটি শিল্পই তৎকালীন ব্রিটিশ পুঁজিতে শ্রমিকশ্রেণী যথেচ্ছভাবে শোষিত হ'ত।

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলনের মোট সদস্য সংখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, রেলওয়ে শিল্পের শ্রমিক সভ্যই সবচেয়ে বেশি ছিল।

প্রথম সম্মেলনে শ্রমিক প্রতিনিধি ছাড়াও ভারতীয় রাজনীতিক জীবনের বিভিন্ন চিন্তাধারার ধারক ও বাহকেরা উপস্থিত ছিলেন, তার মধ্যে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, ভি, জে, প্যাটেল, মিসেস এ্যানি বেশান্ত, এম, এ জিন্না প্রমুখেরা।

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, এস, এ ডাঙ্গে ও এস, ভি ঘাটে।

ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কর্নেল জে, সি, ওয়েজউড।

প্রথম সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে ডেইলি হেরাল্ড পত্রিকার সম্পাদক জর্জ লানসবারী ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, আইরিশ ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেস, আইরিশ উইমেন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন প্রভৃতি গ্রেট বৃটেন ও আয়ার্লাণ্ডের সংগঠন বাণী পাঠিয়ে ছিলেন।

এই সম্মেলন শুধু উপর তলায় জন কয়েক নেতাদের সমাবেশ ছিল না, লালা লাজপৎ রায়কে পুরোভাগে নিয়ে যে শোভাযাত্রা বের হয় তার বর্ণনা থেকে জানা যায়। ব্যাপটিস্টা বলেছেন: সভাপতিকে

নিয়ে ঝাণ্ডা পোস্টার সজ্জিত দশ সহস্র মানুষের যে মিছিল বের হয় তা ছিল সুসংবদ্ধ এমনকি পুলিসের নিয়মানুবর্তিতাও হার মানায়।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে আছে: শ্রমিক আন্দোলনে পুলিসের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা চাই, বেকারী তালিকা প্রণয়ন করা, খাদ্যদ্রব্য রপ্তানী সীমাবদ্ধ করা, দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি ভুক্ত শ্রমিকদের উপর আইনী হামলা বন্ধ করা; দুর্ঘটনায় আহত ও দুঃস্থদের জন্য ক্ষতি-পূরণ, বীমা এবং অসুস্থতার জন্য ছুটির ব্যবস্থা করা।

এই সম্মেলন থেকে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে ফিজিতে ভারতীয় শ্রমিকদের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে তদন্ত করা হোক।

প্রথম সম্মেলনে লালা লাজপৎ রায় সভাপতি, জোসেপ ব্যাপটিস্টা, সি, এফ, এণ্ড্রুজ, মিসেস এ্যানি বেশান্ত, এস, এ, ব্রেলভীকে সহ-সভাপতি দেওয়ান চমন লালকে সাধারণ সম্পাদক ও এস, ডি গ্যাডগিল, ইউ, জি, ডালভি, অনন্তরাম, ভিকুনাথ রামকে সহঃ সম্পাদক করে এক কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

জেনেভাতে আই, এল, ও সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিরূপে লালা লাজপৎ রায় নির্বাচিত হন। বি, পি, ওয়াদিয়া, দেওয়ান চমনলাল ও এন, এম, জোশীকে উপদেষ্টা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

এইভাবে সারা ভারতের শ্রমিকশ্রেণী নিজের শক্তির জোরে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে আই, এল, ও'তে ভারতীয় শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়ন করলেন। কিন্তু ভারত সরকার এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আই, এল, ও'তে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিলেন না।

ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় সংগঠনের জন্ম হ'ল বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্রের

নেতৃত্বের এক সমন্বয়ের সমাবেশের মধ্য দিয়ে। এই কেন্দ্রীয় সংগঠনটিতে এসে ভিড় জমালো সমাজসেবী মানবপ্রেমিক, উদারপন্থী থেকে সুরু করে, সংস্কারবাদী ও বুর্জোয়া চিন্তাধারার প্রতিনিধিরা। তবে সংগঠনের সঙ্গে জঙ্গী কর্মীরাও জায়গা করে নিয়েছিল। যার ফলে প্রথম কেন্দ্রীয় সংগঠনটির পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা ছিল একটি অসম্ভব ঘটনা।

আমরা লক্ষ্য করে থাকবো যে,—সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলনে, গান্ধীজী পরিচালিত শ্রেণী-মৈত্রীর নীতিতে বিশ্বাসী ১৬৪৫০ সদস্যের সংগঠন 'আমেদাবাদ লেবার এসোসিয়েশন' যোগদান করে নি। প্রথম থেকেই সংগঠন মালিক পক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি স্বতন্ত্র সংগঠন রূপে কাজ করে যায়।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ঐ সংগঠনের আদর্শে বিশ্বাসী ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম হয়; তখন তার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয় উল্লিখিত গান্ধী-বাদী সংগঠন। ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ার প্রথম যুগে গান্ধীজীর নেতৃত্বে 'আমেদাবাদ লেবার এসোসিয়েশন' রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকে। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের কিছুদিন পরেই সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান চমন লাল ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে যে বিবৃতি দেন তা সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

দেওয়ান চমনলাল বলেন, 'ভারতের শ্রমিকশ্রেণী! আপনাদের একটি কাজই এখন করতে হবে। তা হল—ঐক্যের শক্তি উপলব্ধি করা। ঐক্যের মধ্য দিয়ে সংগঠনকে মজবুত করতে হবে। ফ্যাক্টরি আইনই আপনাদের মুক্তি এনে দেবে না। আইন আপনাদের ঐক্য এনে দেবে না। আইন ভ্রাতৃত্বের জন্ম দিতে পারে না। এই কাজ আপনাদেরই করতে হবে। কলকারখানায় পুঁজিপতিদের এক আওয়াজ—মজুরদের শোষণ কর। আর এর বিরুদ্ধে আপনাদের আওয়াজ ঐক্য আর ভ্রাতৃত্বের। সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে

মুছে ফেলুন, আপনারাই স্বাধীনতা ও ক্ষমতার অধিকারী একদিন হবেন। আপনাদের মুক্তির শক্তি সংগঠন শক্তির মধ্যে নিহিত।'

এই ঐক্যের আহ্বানে 'আমেদাবাদ লেবার এসোসিয়েশন' সাড়া দেয়নি। গান্ধীজী কেন এ, আই, টি, ইউ সি'তে অংশ গ্রহণ করেন নি সি, এফ, এন্ড্রুজ-এর একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায়। তিনি বি, এন, ডব্লু, রেলওয়ে মেনস্ গেজেটে প্রথম সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে লেখেন যে: চার বছর আগে যখন সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের শুরু, তখন আমি এর থেকে দূরে সরে ছিলাম যদিও সারা জীবন ধরে আমি ট্রেড ইউনিয়নের কাজকেই ভালবেসেছি। ঐ সময় মহাত্মা গান্ধী আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে, সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সংগঠনের সময় আসেনি তাই এই আন্দোলনের শুরুতে বোম্বাই গিয়ে তাতে অংশ গ্রহণ করিনি। মহাত্মা গান্ধীর যুক্তি ছিল, এই: (গান্ধী আমায় বলেছিলেন) "আমেদাবাদে সংগঠন গড়ার কাজে কতটুকুই বা সাফল্য অর্জন করতে পারলাম, যেখানে আমি বহু বছর ধরে সূতা কল শ্রমিকদের ইউনিয়ন পরিচালনা করেছি। তা সত্ত্বেও আমরা এখনো সারা ভারতীয় সংগঠনে যোগদান করায় প্রস্তুত নই যদিও এই দেশের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মধ্যে আমাদের সংগঠন সবচেয়ে অগ্রণী।"

যদি আমার হাতে ক্ষমতা থাকত—গান্ধীজী লিখেছিলেন, "আমেদা-বাদের মডেল অনুসারে সারাভারতে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতাম। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসভুক্ত এটি (আমেদাবাদ) নয় এবং তাই কংগ্রেসের প্রভাব থেকে মুক্ত। আমি আশা করি, এমন সময় আসবে যখন আমেদাবাদের পদ্ধতি গ্রহণ করা ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে সম্ভবপর হবে এবং সর্বভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে আমেদাবাদ সংগঠনকে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এব্যাপারে আমার কোন তাড়া নেই। উপযুক্ত সময়েই সব ঠিক হবে।"

গান্ধীজীর সে ইচ্ছা বাস্তবে পরিণত হয়েছিল সাতাশ বছর পর।

অর্থাৎ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস 'আমেদাবাদ মডেলে' যখন শ্রমিক সংগঠনের জন্ম দিল।

গ। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে'র প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা ছিল, মাদ্রাজের প্রবীন কংগ্রেসসেবী ও মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসিঙ্গরাভেললু চেট্টিয়ারের একটি প্রস্তাব—যে প্রস্তাবে তিনি এ, আই, টি, ইউ, সি'র প্রতিনিধি দলকে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক অধিবেশনে পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

সম্মেলনে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। বাস্তবে সে সময়ে এটি গ্রহণ করা সম্ভবও ছিল না।

সম্মেলনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও আইরিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'কে অভিনন্দন জানান হয়।

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র প্রস্তুত করার জন্য একটি প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং উক্ত প্রস্তাবে বলা হয় যে, খসড়া গঠনতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নগুলির নিকট ও যে সমস্ত ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্ত হতে ইচ্ছুক তাদের নিকট প্রেরণ করা হবে আর উক্ত খসড়া প্রস্তাবকে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বিতীয় সম্মেলনে চূড়ান্তরূপ দেওয়া হবে।

প্রথম সম্মেলনে বোম্বের গভর্ণারকে উপস্থিত হবার জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল, যদিও গভর্ণার বাহাদুর আমন্ত্রণ লিপির জবাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সম্মেলনের নিকট একটি পত্র দিয়েছিলেন। অবশ্য তিনি সম্মেলনে উপস্থিত হন নি।

খ। শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে জন্মলগ্নকাল থেকেই পুলিশী অত্যাচার ছিল এক ভয়াবহতা। সে যুগের পদ্ধতি আজও অব্যাহত রয়েছে। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্নে এই বিষয় গভীর দৃষ্টিপাত দেওয়া হয় এবং একটি বলিষ্ঠ প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়।

শ্রী ই, এল, আয়ার সম্মেলনে প্রস্তাবটি পেশ করেন: "এই কংগ্রেস অভিমত গ্রহণ করছে যে, সরকার সাধারণভাবে এমন একটি নির্দেশ-নামা 'জেলা প্রধান' ও 'পুলিশ বিভাগ'কে দিন, যেন তারা শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠন করার ব্যাপারে কোন বাধা আরোপ না করেন।

সম্মেলনের সামনে প্রস্তাবটি রাখতে গিয়ে শ্রীআয়ার বলেন যে, এই প্রস্তাবটি ভারতে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনে অগ্রগামিতার পক্ষে একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা, তিনি আরও বলেন যে, যেভাবে ভারতের ইউনিয়ন গঠন ব্যাপারে ও শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশী হস্তক্ষেপ চলছে, তার ফলে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার অগ্রগতি ব্যাহত হবে।

কিন্তু এই প্রস্তাবটি সমর্থন করতে গিয়ে জামসেদপুর লেবার এসোসিয়েশনের নেতা এবং টাটা কারখানার শ্রমিক শ্রীতেজা সিং বক্তৃতা প্রসঙ্গে টাটা ইস্পাত কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘটের প্রসঙ্গের জের টেনে বলেন যে:

"ধর্মঘট স্থায়ী হয়েছিল বাইশ দিন আর শ্রমিকরা সবসময় ছিল শান্তিপূর্ণ। কিন্তু তা' সত্ত্বেও কি ফল হয়েছিল?" একজন শ্রমিককে, যাঁর একখানা হাত খোয়া গিয়েছিল, মঞ্চের উপর তুলে বক্তা বললেন—"এই হয়েছিল ফল।" (সেম সেম ধ্বনী)।

"এ কথা বলা সত্যের অপলাপ মাত্র যে, ধর্মঘটি শ্রমিকরা কারখানার মধ্যের রেল লাইন তুলতে চেয়েছিল বলেই তাঁদের আক্রমণ করা হয়েছে। তাঁরা ঐরকম কিছুই করেন নি। গুলি চালনার ফলে বাইশ জন আহত আর

ছ'জন নিহত হয়েছিল।" (সেম সেম ধ্বনী) তিনি গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন—"এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছে এমন একটা কারখানায় যার সঙ্গে সম্মানিত জামসেদজী টাটার নাম জড়িত। যাঁর নাম জামসেদপুরে শ্রদ্ধা আর সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করা হয়ে থাকে।"

তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন "পরিচালকরা তাঁদেব লোকেদের জন্য শুধু মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই করেন নি।" তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন—"আমার নিয়োগ কর্তা, যাঁর নূন খেয়েছি, তাঁর বিরুদ্ধেই আজ আমাকে বলতে হচ্ছে, এই ঘটনার বিরুদ্ধে নীতিগতভাবে বলা দরকার বলে কারন এই ঘটনা ঘটেছে একটি ভারতীয় কোম্পানীতে যার নাম বিশ্ব বিখ্যাত। এই বক্তৃতাব জন্য হয়ত আমার কর্মচ্যুতি হবে। কিন্তু তাতে আমি ভীত নই। শুধু কর্তব্য রক্ষার জন্যই আমি এ কথা বললাম।"

৬। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ইউনিয়নগুলি

১।	বোম্বে মিল ওয়ার্কস্ ইউনিয়ন, বোম্বে—সভ্য সংখ্যা :		১৭৬১ জন
২।	চাফরাসি ইউনিয়ন, বোম্বে	,,	২৭ ,,
৩।	বোম্বে পোর্ট ট্রাষ্ট রেলওয়ে স্টাফ ইউনিয়ন	,,	৩৬০ ,,
৪।	জি, আই, পি, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ মেন্স ইউনিয়ন	,,	৩৭০০ ,,
৫।	মেকানিক্যাল ইনজিনিয়ারস্ এসোশিয়েসন	,,	৯৬ ,,
৬।	এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন, কলকাতা	,,	২৫০৫ ,,
৭।	লেবার এসোসিয়েশন, জামসেদপুর	,,	৪০০০ ,,
৮।	বোম্বে পোর্ট ট্রাষ্ট রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন	,,	৩৭০ ,,
৯।	হ্যাণ্ডলুম উইভার্স ইউনিয়ন, বোম্বে	,,	২৪৯ ,,
১০।	বোম্বে প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন	,,	১৬৯৮ ,,
১১।	ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে মেনস্ ইউনিয়ন, ভূপাল	,,	১৬০০ ,,
১২।	জি, আই, পি, রেলওয়ে মেনস্ ইউনিয়ন, কল্যান	,,	১২০০ ,,

১৩।	ডক ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, বোম্বে	,,	১৮০০ ,,
১৪।	ইণ্ডিয়ান সি-মেনস্ ইউনিয়ন, বোম্বে	,,	১২০৫৬ ,,
১৫।	বোম্বে ইউনাইটেড টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন	,,	২০৪ ,,
১৬।	বোম্বে টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন	,,	৮২ ,,
১৭।	প্যারেল লেবার ইউনিয়ন, বোম্বে	,,	১৫০০ ,,
১৮।	বোম্বে পোর্ট ট্রাষ্ট ওয়ার্কশপ ইউনিয়ন	,,	৭৮৩ ,,
১৯।	বোম্বে প্রেসিডেন্সী পোষ্টম্যানস ইউনিয়ন	,,	৮৫০ ,,
২০।	বোম্বে পোষ্টাল প্যাকার্স ইউনিয়ন	,,	৩৫০ ,,
২১।	বোম্বে টেলিগ্রাফ ম্যানস ইউনিয়ন	,,	৩০০ ,,
২২।	লেবার ইউনিয়ন, আকোলা	,,	৩২ ,,
২৩।	ভেলোড লেবার ইউনিয়ন, কায়রা	,,	২৭৯ ,,
২৪।	মিল হ্যাণ্ডস ইউনিয়ন, শোলাপুর	,,	৩২ ,,
২৫।	মেকানিক্যাল এণ্ড পাম্পিং ওয়ার্কশপ ইউনিয়ন, মাদ্রাজ	,,	৮১ ,,
২৬।	হোটেল সার্ভেন্টস ইউনিয়ন, বোম্বে	,,	৬৮ ,,
২৭।	মিস্ত্রী এণ্ড খানসামা এলাইড ইউনিয়ন	,,	৩২ ,,
২৮।	ক্লার্কস ইউনিয়ন, বোম্বে	,,	৪৪৬ ,,
২৯।	মাদ্রাজ ট্রামওয়ে মেনস ইউনিয়ন	,,	১৭০ ,,
৩০।	বোম্বে ট্রামওয়ে মেনস ইউনিয়ন	,,	২৩১০ ,,
৩১।	প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, করাচি	,,	১২৮ ,,
৩২।	ওয়ার্কম্যানস ইউনিয়ন, কিরকী	,,	৪২০ ,,
৩৩।	ন্যাশনাল ওয়ার্কম্যানস্ ইউনিয়ন, বোম্বে	,,	৪০ ,,
৩৪।	গিরনী কামগড় সঙ্ঘ	,,	১২০০ ,,
৩৫।	ইণ্ডিয়ান লেবার লীগ	,,	৬০০ ,,
৩৬।	ফ্যাক্টরী ক্লার্কস ইউনিয়ন	,,	৬২ ,,
৩৭।	মাণ্ডভি সার্ভেন্টস এসোসিয়েশন, বোম্বে	,,	২০০ ,,

৩৮। বি, বি, এণ্ড সি, আই, রেলওয়ে ওয়ার্কম্যানস ইউনিয়ন ,, ২০০০ ,,

৩৯। জার্ণালিষ্ট ইউনিয়ন, বোম্বে ,, ১৮ ,,

৪০। আর, আই, এম, ডক ক্লার্কস ইউনিয়ন ,, ৭২ ,,

৪১ মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন ,, ৮০০ ,,

৪২। গ্যাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ,, ৭০২ ,,

৪৩। এন, ডবলু, রেলওয়ে-ম্যানস্ এসোসিয়েশন, লাহোর ,, ৭০,০০০ ,,

৪৪। ক্লার্কস ইউনিয়ন, রাওলপিণ্ডি ,, ৬২ ,,

৪৫। অডিট ক্লার্কস ইউনিয়ন, এন, ডব্লু, রেলওয়ে, লাহোর ,, ৭১ ,,

৪৬। তুলথি সঙ্ঘ, আমেদনগর ,, ২৪৮ ,,

৪৭। কানপুর মজুর সঙ্ঘ ,, ১৮০০ ,,

৪৮। পাঞ্জাব ক্লার্কস্ ইউনিয়ন, লাহোর ,, ১১২ ,,

৪৯। পোষ্টাল এসোসিয়েশন, আমেদাবাদ ,, ১১৩ ,,

৫০। বোম্বে প্রেসিডেন্সী পোষ্টাল এসোসিয়েশন ,, ৭২ ,,

৫১। এস, আই, রেলওয়ে এমপ্লয়িস ইউনিয়ন, মাদ্রাজ ,, ৯৩ ,,

৫২। বোম্বে মিল হ্যাণ্ডস ইউনিয়ন ,, ৫২ ,,

৫৩। মাদ্রাজ কুলি ইউনিয়ন ,, ১৮৯ ,,

৫৪। বি, ও, সি, এমপ্লয়িস ইউনিয়ন বোম্বে ,, ৮০৮ ,,

৫৫। এম, এস, এম, রেলওয়েমেনস্ ইউনিয়ন, মাদ্রাজ ,, ৮১২ ,,

৫৬। খানবাজার সার্ভেন্টস ইউনিয়ন ,, ৫৬ ,,

৫৭। জি, আই, পি, রেলওয়ে আডিট ক্লার্কস ইউনিয়ন ,, ৮৫ ,,

৫৮। ডেকান পোষ্টাল এসোসিয়েশন, সাতরা; ৫৯। ক্লার্কস ইউনিয়ন, পুনা; ৬০। তুলাথি এসোসিয়েশন, রত্নগিরি; ৬১। কামগড় হিতবর্দ্ধক সভা; ৬২। বোম্বে ক্লথ মার্চেন্টস সার্ভেন্টস ইউনিয়ন; ৬৩। দি মিমস্কুই এমপ্লয়িস ইউনিয়ন, মিরাজ; ৬৪। আর, এম, এস, এণ্ড পোষ্টাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, আমেদাবাদ; ৬৫। বোম্বে সর্কার্স মিউচুয়্যাল বেনিফিট ইউনিয়ন;

৬৬। সিলোন ওয়ার্কাস ফেডারেশন, কলম্বো, ৬৭। রেলওয়ে ওয়ার্কমেনস এসোসিয়েশন, রাণীঘাট, ৬৮। প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, দিল্লী; ৬৯। মাদ্রাজ পুলিশ ম্যানস্ ইউনিয়ন; ৭০। ওয়ার্কম্যানস ইউনিয়ন, করাচী; ৭১। এম, এস, এম, রেলওয়ে ইনঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কম্যানস ইউয়িন, অমরবতি; ৭২। মাদ্রাজ সেনট্রাল লেবার বোর্ড, মাদ্রাজ, ৭৩। বি, এন, রেলওয়েম্যানস এসোসিয়েশন, খড়্গপুর; ৭৪। ডিসট্রিক ক্লাকর্স ইউনিয়ন, অমরাবতি; ৭৫। রেলওয়ে ওয়ার্কম্যানস এসোসিয়েশন, জামসেদপুর; ৭৬(ক)। ঐ জামালপুর; ৭৬(খ)। ঐ এলাহাবাদ; ৭৭। ঐ লাক্ষনৌ; ৭৮। আর, এম, এস, এসোসিয়েশন, মাদ্রাজ; ৭৯। ইউ, পি, পোষ্টাল এণ্ড আর, এম, এস ইউনিয়ন, লক্ষনৌ; ৮০। পাঞ্জাব পোষ্টম্যানস ইউনিয়ন, লাহোর; ৮১। পোষ্টাল ক্লাকর্স ইউনিয়ন, লাহোর; ৮২। পোষ্টাল এণ্ড আর, এম, এস, ইউনিয়ন, কানপুর; ৮৩। মিলিটারী একাউণ্টস এসোসিয়েশন, পুনা; ৮৪। দি পিওনস এসোসিয়েশন, পুনা; ৮৫। রাজেন্দ্রনগর মিল হ্যাণ্ডস ইউনিয়ন, রাজেন্দ্রনগর; ৮৬। Podnnur রেলওয়ে এমপ্লয়িস ইউনিয়ন, পোডনুর; ৮৭। কোয়াম্বাটুর লেবার ইউনিয়ন, কোয়েম্বাটুর; ৮৮। মজুর সঙ্ঘ, জামালপুর (সি. পি.); ৮৯। মাদ্রাজ রিক্সাওয়ালা ইউনিয়ন, মাদ্রাজ; ৯০। বি, বি, এণ্ড সি, আই, ওয়ার্কম্যানস ইউনিয়ন, আমেদাবাদ; ৯১। ক্যালকাটা পোষ্টাল ক্লাব, কলকাতা; ৯২। প্রভিনসিয়াল পোষ্টাল এণ্ড আর এম, এস, এসোসিয়েশন, লাহোর; ৯৩। লথ্রাজ ফ্যাক্টরী ওয়ার্কম্যানস্ ইউনিয়ন, জব্বলপুর, ৯৪। মাদ্রাজ পোষ্টম্যান ইউনিয়ন, মাদ্রাজ; ৯৫। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সি-মেনস্ ইউনিয়ন, কলকাতা; ৯৬। প্রেস ম্যানস্ ইউনিয়ন, কলকাতা; ৯৭। গভর্ণমেণ্ট প্রেস ওয়ার্কাস পিস্ এসটাবলিসমেণ্ট ইউনিয়ন, দিল্লী; ৯৮। প্রেস ওয়ার্কাস ইউনিয়ন, লাহোর; ৯৯। রেলওয়ে ওয়ার্কম্যানস এসোসিয়েশন, ইগতপুরী; (through Mr. Pryke) ১০০। রেলওয়ে ওয়ার্ক ম্যানস এসোসিয়েশন (through ; Mr. Laskari)

অতিরিক্ত তালিকা :

১। বোম্বে পোর্ট ট্রাষ্ট ইউনিয়ন (ইনঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ)

সভ্য সংখ্যা—৮০০ জন

২।	ওয়াললেক্ ফ্লাওয়ার মিল ইউনিয়ন	,,	১৫০ ,,
৩।	সিমপ্লেক্স মিল ইউনিয়ন	,,	১১০০ ,,
৪।	আউদ এণ্ড রোহিলখণ্ড রেলওয়ে ইউনিয়ন	,,	১০,০০০ ,,
৫।	গ্লোব মিল ইউনিয়ন	,,	৩০০০ ,,
৬।	ইণ্ডিয়ান সিমেনস্ ইউনিয়ন, বোম্বে (অতিরিক্ত)	,,	৫৯৪৪ ,,
			২০,৯৯৪

৮। এ, আই, টি, ইউ, সি'র প্রথম কমিটি

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে একটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করা হয়। ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন শ্রীমাভজী গোবিন্দজী। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে "(ক) কংগ্রেসের (সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস—লেখক) ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি এক বছরের জন্য নিয়োগ করা হোক, যে কমিটি সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র গৃহিত না হওয়া পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন সাপেক্ষে একটি স্থায়ী সংস্থা হিসেবে ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট খবরাখবর সংগ্রহ করবে ও ইউনিয়নগুলিকে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করবে (খ) এই কমিটিতে থাকবে: (১) এই অধিবেশনের সভাপতি পদাধিকার বলে ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভাপতি হবেন; (২) সহ সভাপতি—মিঃ ব্যাটিস্টা; (৩) সভাপতি ও সহঃ সভাপতি একজন সারাক্ষণের পুরা বেতনের সম্পাদক নিয়োগ করবেন; (৪) তিন সারা

* এই তালিকা সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের বিবরণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

অনুসারে একজন অফিস সম্পাদক নিয়োগ করতে হবে; (৫) এই কমিটির সদস্যদের ক্ষমতা থাকবে—প্রয়োজন বোধে যে কোন ব্যক্তিকে এবং যে সকল ইউনিয়ন পরে স্বীকৃতি পাবে তাদের প্রতিনিধিদের কো-অপট করার।

(গ) এই ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিকে বোম্বাইতে একটি হেড অফিস করা, অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় করার অধিকার দেওয়া হোক। সভাপতি, সহঃ সভাপতি ও সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনা করে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বৈঠকের দিন নির্দিষ্ট করবেন।

(ঘ) অধিকাংশের সমর্থনের ভিত্তিতেই কমিটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। এই প্রস্তাবের বিভিন্ন ধারা গুলো মিঃ গোবিন্দজী পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে বলেন: এই বোম্বাই নগরীর মহান রাজনৈতিক সমাবেশে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠন করার কৃতিত্ব হয়েছিল, আর একবার সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন করার কৃতিত্ব তার হল। (হর্ষধ্বনি) তিনি সারা দেশে সকলকে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার আহ্বান জানিয়ে কংগ্রেসকে (ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস—লেখক) সফল করার কথা বলেন। তারা সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নামে একটি ইঞ্জিন তৈরী করছেন, এখন এই ইঞ্জিনকে চালু রাখার জন্যে অর্থ জোগাতে হবে।"

মিঃ মাওজী গোবিন্দজীর প্রস্তাবিত ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির নামগুলো সভাপতি মহাশয় পড়ে দেন, আর মিঃ আরজু ও মিঃ পণ্ডিত প্রস্তাব সমর্থন করেন।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভ্যদের নাম:—

Lala Lajpat Rai, Mr. Joseph Baptista, D. Chaman Lall, M. D. Dalvi, L. R. Tairsee, D. D. Sathye, N. D. Sawarkar, M. B. Velkar, Shet Mawaji Govindji, F. J. Ginwalla, S. H. Jhabwala, L. G. Khare, S. A. Brelvi, N. M. Joshi, Kanji Dwarkadas, E. L. Iyer, S. N. Haldar, Deep Narayan Singh, V. M. Pawar, B. P. Wadia, Annantaram Vaikunthram. Lala

Dunichand, J. B. Miller, Lala Ishwardas Sawnhey, M. A. Khan, G. R. Sawnhey, Kumar Swami Chetty, Vaman Ananta Patel, D. G. Pandit, V. Chakrai Chetty, Mistry Karam Illahi, Subramanyam Nayekar, Vinayak Shirodkar, Rajaram Gopal, Govind Tukaram, Shiv Nandan, G. K. Gadgil, Venkatram Pele, A. V. Paranjpe, Shankar Nachvekar, J. T. Gokhale, C. M. Preira, N. J. Rawal, Jitan Singh, Sitaram Shivaji, S. Satyamurthi, Krishnaram, Keshvram Bhatta, C. V. Sawant, Trimback Sitaram Sawant, Tej Sing Bhar, Bapu Ram Chandra, M. R. Arzoo, K. S. Herlekar, B. K. Kane, Amrit Lall Sarma, N. L. Matkar, Abdulla Rahman Kazi, Tukaram Santaji, J. B. Naik, Mrs. Deep Narain Singh, Mr. K. Santanam, Lala Jagannath, Shankar Ladoba, Pandurang Sabaji Masurkar, A. B. Kalhatkar, Swami Vishwanand, R. K. Misra, T. H. Kanna, G. S. Kanthi, Madhavrao, P L. Maltekchand, Mrs. Avantikabai Gokhale, Miss. Chattopadhya, Miss Reuben, M. B. Manier, Jalil Khan, Mrs. Gulabchand Deochand, Mr. G. A. Pradhan, Mr. Nabkarni.[1]

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে জুলাই ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভার পর এই পাঁচজনকে কো-অপ্ট করে নেওয়া হয়।

Messrs. Tendudar, Bhukandass, Murari Lal, Alfonso, Dalvi.[2]

১। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের বিবরণী থেকে।

২। ঐ।

দশম অধ্যায়

রুশ বিপ্লব ও ভারতের শ্রমিক শ্রেণী

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর (নতুন রুশ হিসেবে নভেম্বর) বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে রুশ দেশের শ্রমজীবী শ্রেণী পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে' সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম দিল। রাশিয়ার শ্রমজীবী শ্রেণীর এই সাফল্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সর্বহারা মানুষের মনে আশার সঞ্চার করে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ও শ্রমিক আন্দোলনে নতুন ভাবে এক চিন্তার প্রভাব বিস্তার করে। আর শোষণ ও সামাজিক অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে বিশ্বের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন নতুন করে উৎসাহী হয়ে আরও তীব্র আকারে আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু এই ঘটনাও সত্যি যে, রুশ বিপ্লবের ফলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শক্তির মধ্যেও দোলা লাগে এবং নিজ নিজ রাজনৈতিক শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আন্দোলনের মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে বিভিন্ন দেশের মতই আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনে দু'টি বিপরীত চিন্তার ও রাজনৈতিক দর্শনের সক্রিয়তা দেখা দেয়।

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম মহাযুদ্ধ কালটা ছিল—ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতার এবং এই আশায় জাতীয় কংগ্রেস সহযোগিতা করেছিলেন যে, যুদ্ধের সমাপ্তির পর ভারত সম্রাটের কাছ থেকে জাতীর জন্য কিছুটা ক্ষমতা তাঁরা আদায় করে নেবেন।

তাঁরা এই চিন্তা নিয়েই শ্রমিক আন্দোলনকেও প্রভাবিত করেছিলেন এবং সে ভাবে আন্দোলন পরিচালনাও করেছিলেন।

মাদ্রাজের ব্রিটীশ পুঁজির কারখানা বিন্নী কোম্পানীর শ্রমিকেরা শোষণের বিরুদ্ধে যখন সজীব, তখন জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নেতা শ্রী বি. পি. ওয়াদিয়া শ্রমিকদের নিকট বিবৃতি দিলেন: "আপনারা ধর্মঘট করে যদি বিন্নী কোম্পানীর পকেটে টান দিতেন তা'হলে আমি কিছুই মনে করতাম না, কারণ তারা প্রভূত অর্থ মুনাফা করছেন; কিন্তু এরকম একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করে আপনারা আমাদের সৈন্যদের অসুবিধা করেছেন, কারন তাদের তো কাপড় চোপড় পরতে হবে; এই মিলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন ইউরোপীয়ান এবং তাঁদের সরকার বদভাবে কাজকর্ম করেছে বলে যাঁরাই আমাদের রাজার জন্য লড়ছেন তাঁদের অসুবিধা ঘটাবার কোন অধিকার আপনাদের নেই। কাজেই আমাদের ধর্মঘট করা অবশ্যই অনুচিত।"১

অবশ্যই বি. পি. ওয়াদিয়ার এই রাজভক্তির পুরস্কার ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে পেতে হয়েছিল অর্থাৎ রাজসন্তানেরা কারখানা লক আউট ঘোষণা করে ও ওয়াদিয়ার উপর হাইকোর্ট থেকে একটি ইন্‌জাঙ্‌শন জারী করায়, যার ফলে ওয়াদিয়াকে শ্রমিক আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকতে হয়, আর সর্বশেষে তাঁকে এই দেশ ছেড়ে চলেও যেতে হয়েছিল। এই ঘটনাটি উল্লেখ্য এই জন্যই যে বি. পি. ওয়াদিয়ার মত "হোম রুল" আন্দোলনের অসামান্য নেতারা ত শাসক ও শোষকের চরিত্র সম্বন্ধে ছিলেন মোহগ্রস্ত এবং শ্রমিক আন্দোলনেও তার প্রক্ষেপ ঘটেছিল।

আর ঠিক এই সময়ে গান্ধিজী শ্রমিক আন্দোলনে নিজেকে শরিক করে নিলেন। যদিও গান্ধিজীকে শ্রমিক আন্দোলনে প্রবেশ করানোর সম্পূর্ণ কৃতিত্বটি ছিল, আমেদাবাদ বস্ত্রশিল্পের কুমার, শেঠ আম্বালাল সারাভাই-এর। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে দেশীয় পুঁজির পীঠস্থান আমেদাবাদ বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা দেখা দেয়,—সে সময়ে সারাভাই গান্ধিজীর সঙ্গে

1. Madras Labour by B. P. Wadia.

বোম্বেতে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁকে আমেদাবাদ আসার জন্য প্রার্থনা জানান।২

গান্ধিজী শ্রেণী সমন্বয়ের এক নতুন রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে আমেদাবাদে শ্রমিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে 'মজদুর মহাজন' (আমেদাবাদ বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের ইউনিয়ন) প্রতিষ্ঠা করেন।

'মজদুর মহাজন'-এর আদর্শ হ'ল যে ক্যাপিটালিস্টরা সমাজের অছি কেন না তারা অজ্ঞ শ্রমিক সাধারণ থেকে ঢের বেশী বুদ্ধিমান এবং সে কারণেই ক্যাপিটালিস্টরা সমাজের প্রয়োজনীয় অংশ। ক্যাপিট্যাল এবং শ্রমিককুল একই সমাজ রথের দু টি চাকা যার সাহায্যে সমাজ-জীবন প্রবহমান।

'মজদুর মহাজন'-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং গান্ধীবাদের শ্রেণীরূপ আরও পরিচ্ছন্ন হয়ে প্রকাশ পায়, আমেদাবাদের শ্রমিকদের নিকট গান্ধীজীর একটি বক্তৃতা থেকেই। তিনি শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, "আপনাদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হয়েছে এবং আরও উন্নত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি দুভাবে হতে পারে -মিল মালিকদের সহযোগিতায় অথবা অনাবশ্যক চাপ সৃষ্টি করে। প্রথমটি হ'ল প্রতিকারের প্রকৃত উপায়। পাশ্চত্যদেশে শ্রমিক ও ধনীক শ্রেণীর ভীতর এক চিরন্তনদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। একদল অপর দলকে স্বাভাবিক শত্রু বলে মনে করে। এই মনোভাব ভারতবর্ষেও দেখা যাচ্ছে। এবং এই মনোভাব যদি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তা' হলে আমাদের দেশে শিল্পেও শান্তি বিঘ্নিত হবে। যদি দু'পক্ষই উপলব্ধি করত যে, উভয়ই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, তা হলে ঝগড়ার কোন সুযোগই থাকত না।"৩ এই চিন্তাধারা নিয়েই গান্ধীজী শ্রমিক আন্দোলনে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

১৯১৭-১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘটের সংগ্রামী

---

2. A Rightous Struggle by Mahadev Hari Bhai Desai.
3. Young India – 1920.

তরঙ্গগুলো, ঘুমভাঙ্গার এক বিপুল ইঙ্গিতরূপে দেখা দিল, আর এর মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের সচেতনতাও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে দেখা গেল। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি যে মোহগ্রস্ত জড়তা দেখা গিয়েছিল তাতে এ-সংগ্রাম তীব্র আঘাত করল। এতদিন পর্যন্ত যে জাতীয় কংগ্রেস রাজনৈতিক দল হিসেবে শ্রমিক আন্দোলন থেকে দূরে সরে ছিল, এযুগে তা' আর সম্ভব ছিল না। এই সময়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে দু'টি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি বুর্জোয়া জাতীয়বাদী ধারা ও অপরটি বিপ্লবী জাতীয়বাদী ধারা এবং তাতে শ্রমিক আন্দোলন এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বিপ্লবী জাতীয়বাদী ধারা, রুশ বিপ্লবের ফলে অনেক বেশী উজ্জীবীত হয়ে উঠেছিল। এর ফলে, শ্রমিক আন্দোলনও দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। গান্ধীজী ছিলেন শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে বুর্জোয়া জাতীয়বাদের ধারার বাহক ও নেতা আর তিলক, বিপিন পাল ও লাজপত রায় ছিলেন বিপ্লবী ধারার অগ্রগামী নেতা। গান্ধীজী আমেদাবাদ 'মজদুর মহাজন' প্রতিষ্ঠা ক'রে সে ধারার মডেল তৈরী করলেন। কিন্তু আমেদাবাদের চৌহদ্দি ছেড়ে সে ধারা অন্যত্র প্রবাহিত হ'তে পারে নি। সে যুগে বোম্বে ও বাঙ্গলাদেশের শ্রমিক আন্দোলন, গান্ধিজীর শ্রমিক দর্শনের চিন্তা গ্রহণ করে নি। এই দু'টি প্রদেশে তিলক ও বিপিন পাল রুশ বিপ্লবে প্রভাবিত হয়ে, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নতুন চিন্তার অনুপ্রকাশ ঘটান।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বে ও মাদ্রাজে বড় বড় শ্রমিক সভায় তিলক যে ভাষণ দেন, তাতেই সে কথা প্রমাণিত হয়ে যায়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর বোম্বের এক শ্রমিক সভায় তিলক পশ্চিমের শ্রমিক শ্রেণীর কথা উল্লেখ করে বলেন যে, 'তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য এবং উৎপাদনের উপায়াদির মালিক হবার জন্য সংগ্রাম করছেন।'[৪] তার একুশ দিন পর মাদ্রাজের পেরামবুরের এক শ্রমিক সভায় বলেন যে, "কালক্রমে

৪। ভারতবর্ষ ও রুশ বিপ্লব—শ্রীনিগম সরদেশাই।

শ্রমিক সংগঠনের কর্তৃত্ব অবশ্যই বাড়বে, আর শ্রমিকেরা হবেন শাসক।"৫

এটিও মনে রাখা দরকার তিলকের এই উপলব্ধি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সুসংগঠিতভাবে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য এবং শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করার জন্য কোন সংগঠনশক্তি ছিল না। আর তিলকের পক্ষে সে কাজ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই ব্যক্তব্যের কয়েক মাস পরই তিলকের জীবনাবসান ঘটে। ভারতীয় সমাজজীবনে যে নতুনের ইঙ্গিত দেখা গেল, তা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যায়নি।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের পঁয়ত্রিশতম অমৃতসর অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সে প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, "শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্যে এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করা আর ভারতের সমাজজীবনে তাদের যোগ্য স্থান নিশ্চিত করবার জন্যে দেশের সর্বত্র শ্রমিক ইউনিয়ন গড়বার জন্যে এই কংগ্রেস সমস্ত প্রাদেশিক কমিটি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সমিতিকে আহ্বান জানাচ্ছে।" আর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে শ্রমিকশ্রেণীর বিষয়ে আরও বেশী সক্রিয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। সে প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, ভারতের শ্রমিকদের প্রতি এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন মারফত তাঁদের ন্যায্য দাবি আদায়ের সংগ্রামের প্রতি এই কংগ্রেস পূর্ণতম সহানুভূতি প্রকাশ করছে। এই প্রস্তাবের ফলে একথা অনায়াসে বলা যায় যে, রুশ বিপ্লবের ফলে আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলনের চেতনায় এক নতুন গভীরতা সৃষ্টি করতে পেরেছিল এবং রুশ বিপ্লবের ফলেই জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে বিপ্লবী ধারাটি আরও বেশী সক্রিয় হ'তে পেরেছিল। তার প্রমাণ মেলে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে, যিনি সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসেরও

৫। ভারতবর্ষ ও রুশ বিপ্লব।

প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং উক্ত কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে ভাষণে বলেছিলেন যে, "আজ যে আন্দোলনের উদ্বোধন আমরা করেছি তা'র জাতীয় গুরুত্ব অনেক বেশী, এবং এর আন্তর্জাতিক গুরুত্বও রয়েছে। ভারতের শ্রমিক আজ শুধু ভারতের শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে না, সে আজ প্রাণমন দিয়ে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে।...তিনি আরও বলেন যে, 'ইউরোপের শ্রমিকেরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আর একটি অস্ত্র আবিষ্কার করেছেন। তাদের নেতা হিসাবে বেরিয়েছেন রুশ শ্রমিকেরা, যাদের লক্ষ্য সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা।'...

এই মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করলেন, সোবিয়েত ইউনিয়ন হ'ল ন্যায়ের মুখপাত্র, এরা সমাজতান্ত্রিক ও শ্রমিক ধর্মী সত্যের বাহক।...আজকে বলশেভিক সত্য অনেক বেশি উঁচুদরের এবং ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী সত্যের চেয়ে অনেক বেশি মানবিক।" ৬

আর ঠিক এই সময়েই ভারতের মাটিতে রুশ বিপ্লবের আবাহণ করা হল, যখন বলশেভিকবাদের প্রতিরোধ করবার জন্য ভারত সরকার বার্ষিক ৯০ হাজার পাউণ্ড ব্যয়ের একটি ব্যুরো স্থাপন করেন। ৭

ভারতের শ্রমিক মঞ্চ থেকে এই সর্বপ্রথম শ্রমিক আন্তর্জাতিকতার কথা ঘোষণা করা হল এবং রুশ বিপ্লব যে সবচেয়ে বড় মানবিক সত্য এই কথাও ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় জমায়েত থেকে উচ্চারিত হল। অথচ সে সময়ে ভারতে কোন কমিউনিষ্ট, এমন কি একজন সমাজতন্ত্রীও ছিলেন না।

আর পারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলনের পরেই সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান চমনলাল, শ্রমিকশ্রেণীকে স্বরাজ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালেন।

রুশ বিপ্লবের আদর্শগত উপলব্ধি এর চেয়ে আর কি গভীর হতে পারে।

---

6. A. I. T. U. C. First Sessional Report.
7. Amrita Bazar Patrika—1920.

॥ লেখকের আরও কয়েকটি বই ॥

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ইতিহাস

প্রথম প্রকাশ : পৌষ—১৩৬৬ (১৯৫৯)

Indian Trade Union Movement

First Publication Nov.—1961.

ভারতে প্রথম ধর্মঘট ও শ্রমিক ধর্মঘটের দিনলিপি

মে—১৯৬৫

Maiden Strike in India

May—1966.